INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY

ALUMNI ASSOCIATION OF USA & CANADA

https://becaaeastcoast.org/

Annual Publication, 2021

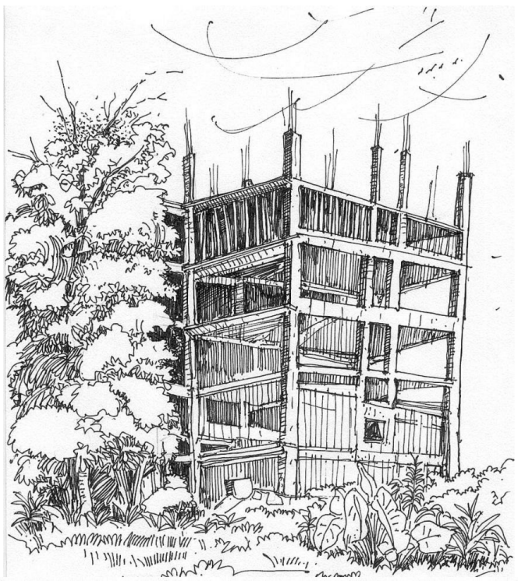

GOLDEN JUBILEE

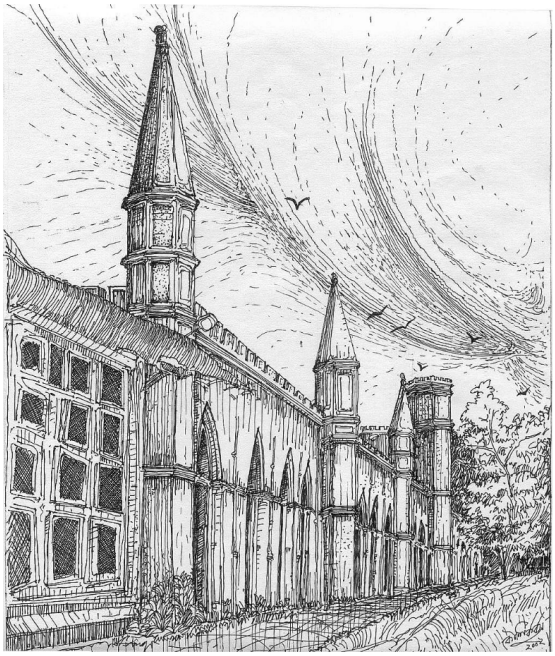

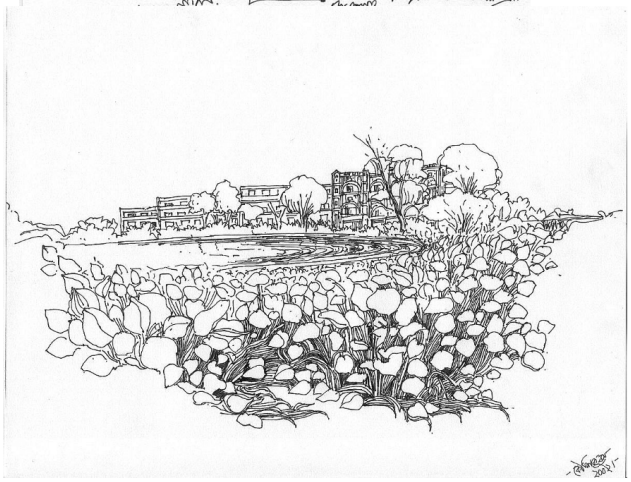

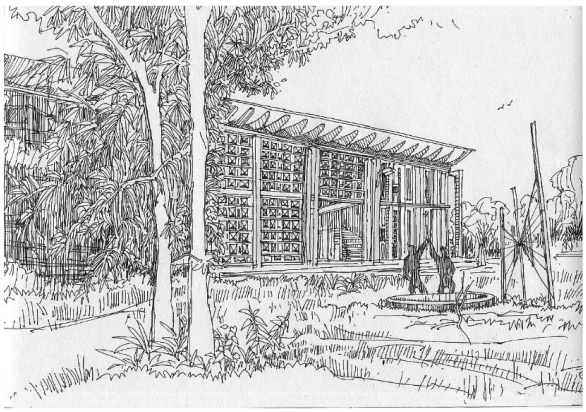

Courtesy: Campus sketches by Kaushik basu , a student of Electrical Engineering

With Best Compliments from our sponsors:

BENGAL ENGINEERING COLLEGE
ALUMNI ASSOCIATION
GOLDEN JUBILEE PUBLICATION

Federal Tax exempted Non-Profit Association
Tax Exemption ID# 22-2394370

THIS PUBLICATION OR ANY PART THEREOF MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION

AS THE OBJECTIVE OF **BECCA** TO BE A FORUM FOR FREE EXPRESSION AND INTERCHANGE OF IDEAS, THE OPNIONS, STATEMENTS AND POSITIONS ADVANCED BY THE CONTRIBUTORS ARE THOSE OF THE AUTHORS AND NOT, BY THE FACT OF PUBLICATION, NECESSARILY THOSE OF **BECCA**. THEREFORE, BECCA DOES NEITHER ASSUME ANY RESPONSIBILITY NOR BEAR ANY LIABILITY FOR THE PUBLISHED MATERIAL CONTAINED IN THIS PUBLICATION

BECAA Website and Social Networking

Our Website:

https://www.becaaeastcoast.org/

Our Facebook Page:

https://www.facebook.com/BECAEastCoast/

Twitter handle:

https://twitter.com/becaaeastcoast

Any questions/suggestions, please reach out to:

Site Admin:
Tanmoy Sanbui
Mail-to: tanmoy_sanbui@yahoo.com
Contact: 203-524-5216

Bengal Engineering College

Alumni Association of USA East Coast Chapter
Est. 1971

INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE & TECHNOLOGY

(Formerly B.E. College)

President

Niloy Jana

Vice-President

Sheuli Majumder

General Secretary

Soumyabrata Roy

Treasurer

Joydeep Samanta

Executive Members

Soumalya Chowdhury
Debashis Das
Suman Chandra

Advisory Committee

Asok Chakrabarti
Tanmoy Sanbui
Saroj Bhol
Bhaskar Dasgupta
Auyon Chowdhury
Debabrata Chaudhuri
Amalendu Mukherjee
Amitabha Chatterjee
Prabir Dhara
Debabrata Sarkar
Moloy Nath

Past 5 Presidents

Debabrata Chaudhuri
Dilip Bhattacharya
Amitabha Chatterjee
Sitansu Sinha
Kumud Roy

Dear Alumni,

We continue to live in great uncertain times with the outbreak of Covid-19 across the globe that started in December 2019. The sufferings of our friends and families across the globe are very painful to see during this pandemic. Bengal Engineering College (IIEST, Shibpur) Alumni Association (BECAA) of USA and Canada stand by and show solidarity sharing the sorrow and pain with the loss of our near and dear ones during this challenging time.

During these unprecedented circumstances, in order to bring smile to our Alumni families, I am delighted to inform you about organizing our Golden Jubilee (50th) BECAA Reunion this year in person to be attended by Alumni family members. This is a tremendous accomplishment by our Alumni Association and exemplifies our strong dedication to our Alma Mater.

We are proud to note that our younger Alumni members have implemented a diverse program of social, cultural and recreational activities virtually during the past year. Their efforts and enthusiasm have motivated the association members to a new level of involvement. We hope to see these efforts continue in the coming years despite going through a very difficult time.

I would also thank some of our members including our BECAA Core team/working committee help organizing this event involving all participating members and their families and also put an outstanding effort in preparing this Magazine for circulation among our members. I would also like to notify all of you about the change in our executive committee taking place effective our reunion and AGM Day i.e September 11, 2021. Wishing our upcoming executive team all the best and request you all to extend your support to the new committee.

Like in the past years, we congratulate GAABESU for all their activities at the international level and the necessary help that is being extended to the concerned alumni across the globe.

Lastly, I would request all of our members to remain both mentally and physically strong during this difficult time helping our community and our fellow alumni in need across the globe.
Sincerely,

Niloy Jana
President, BECAA

ভালো ছেলেদের কথা

--সুমন কুমার চন্দ্র (1998 EE)

আমি এখানে শুধু একা আমি নই। কল্পনার রঙে মেশানো এক বাস্তব আমি। এতে অবশ্যই খুঁত আছে, খামতি আছে। মিথ্যে বা অতিশয়ক্তি আছে হয়ত তবে সত্যিও আছে। সমাজ সংস্কার করতে চায় না এই আমি, না চায় কোনো চেনা ছক ভাঙতে। শুধুই মনের কথা মনে করানোর চেষ্টা মাত্র ।

ছোটো বেলায় বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার চোখে সেরা হবার জন্য বেশ পড়াশুনা করতাম – অবশ্য সে সবই বেশী নম্বর পেয়ে ফার্স্ট-সেকেন্ড হবার জন্য, কোনো কিছু জানা বা শেখার জন্য নয়। কারণ সবসময়ই তো শুনতাম অমুকের ছেলে কত ভালো রেজাল্ট করে, জয়েন্টে কত ভালো rank করে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কত বড়ো কোম্পানিতে কত ভালো কাজ করে। সে কি কাজ করে বা কাজ করে সে কত খুশী আছে বা এত ভালো কাজ-টাজ করার পরেও তারা ভালো আছে কি না তার খবর কেউ দেয় নি। ধরে নিতাম তারাদের মতোই তারা সবসময় জ্বলজ্বল করছে।

আমাদের সময় মুড়ি-মুড়কির মতো এত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল না, ভালো কলেজ তো ছিল হাতে গোনা। কিন্তু জয়েন্টে তো চান্স পেতে হবে – না হলে যেন জীবন বৃথা। তাই শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছোটাছুটি করতাম। এ টিচার, ও টিচার, এই কলেজ, ওই কোচিং – তারপর আবার বাড়ীতে এসে পড়া। পড়তে ভালো লাগতো বললে ডাহা মিথ্যে বলা হয়। Organic Chemistry-র মতো এত প্রাণহীন রস কম পেয়েছি জীবনে। কিন্তু তা বললে তো চলবে না। সেই যেমন করে বাবরের বাবার নাম, কোহিনুর কে ঝাপস্ করেছে বা বক্সাইটের বস্তা কোথায় পাওয়া যায় এসব মগজে গুজেছি তেমনি যতটা পেরেছি সব গুজে-ঠেসে-মেখে ব্রেনোলিয়া বয় হয়েছি। পড়াশুনা তো করতে ঠিক চাইনি, করতে হয়েছে – অনেকটা "ডাকছে জয়েন্ট, ডাকছে IIT"-র হাতছানিতে "ও ছেলেরা খেলা ফেলে, শুধুই চল পড়তে যাই"। এতে জীবন-যৌবন ও কিছুটা খোয়া যাচ্ছিল – তবে মন কি আর হার মানতে চায় !মনে মনে তো আমিই অমিতাভ, আমিই শাহরুখ। যেন মেয়েরা আমার স্কুল-কলেজের রেজাল্ট দেখেই ফিদা হয়ে লাইন দেবে আমাকে পাবার জন্য। কারণ আর তো কিছু দেখানোর মতো ছিল না কাকা। চোখে পুরু চশমা বা zero personality দেখে তো আর কেউ ফিদা হয় না। এমন ই ভুলভাল পড়াশুনার মধ্যগগনের এক সময়, IIT-র mock test দিতে গিয়ে দেখি অনেক মেয়েরাও এসেছে। দেখে খুব ভালো লাগল আবার খারাপও লাগল। ভালো লাগল এই ভেবে এরা কত বুদ্ধিমতি, এরা দেশের প্রথম সারির মেয়ে, দেশের গর্ব। খারাপ লাগল এই দেখে যে জীবনের উঠন্ত বয়সেই পড়ন্তের কি করুণ ছাপ। ওদের দিকে তাকিয়ে পড়াশুনার প্রতি সেই প্রথম তীব্র ঘৃণা জন্মায় আমার – পড়া পড়া করে যেন এদেরও সব পুড়ে গেছে।

শুনেছি প্রেমে নাকি বন্ধুত্বের শেষ আর বিবাহে প্রেমের শেষ। ঠিক তেমনি এই জয়েন্ট-IIT পাওয়া মানে পড়ার ইচ্ছের শেষ আর চাকরী পেলে পড়ার শেষ। জোড় করে আর কত টানা যায়! জয়েন্ট পেয়ে, ভালো কলেজে চান্স পেয়ে, শুধু প্রফেসরদের নোট পড়ে, আবার ভালো নম্বর পেয়ে ভালো চাকরীও জুটিয়ে ফেললাম। চাকরী পেয়ে নিজেকে কি কেউকেটাই না মনে করতাম। অবশ্য আজও করি। আগে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দাদাদের মুখে শুনেছিলাম ragging করা হয় নাকি নবাগতদের স্মার্ট করার জন্য। এটা একটা মহা ঢপ্। মনের খিদে মেটানোর জন্য ragging করা, otherwise না আমার দাদারা স্মার্ট ছিল, না আমরা, না আমার মত আমার ভাইয়েরা। স্মার্ট হতে গেলে বইয়ের বাইরে বেড়িয়ে বাস্তব দেখতে হয়। যারা জয়েন্ট-IIT পায় তারা সাধারণত স্মার্ট হয় না। Calculus জানলে তো আর মেয়েদের মনে জায়গা পাওয়া যায় না খোকা, সেই জায়গা পেতে ইংরাজী জানতে হয়। 'Like', 'I mean', 'yeah' এসব বললে তো নিজের খামতি ধরা পড়ে, ইংরাজীর জ্ঞান নয়। তাই স্মার্ট মেয়েরাও সাধারণত আমাদের কপালে নেই। এটা মেনে নিলেই ভালো, না হলে নিজেরই কষ্ট।

কিন্তু মন কি আর হার মানতে চায়! তাই অনেক বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে, অনেক পরিশ্রম করে, অনেক ভালো রেজাল্ট করে, অনেক ভালো চাকরী পেয়ে, অনেক টাকা রোজগার করেও আমি কিন্তু কষ্টে আছি, রেগে আছি, জ্বালায় আছি। শাহরুখের ক্যাটরিনা বা অমিতাভের পরভিন বাবি জুটল না। কারুর জুটল ধন্যি মেয়ে, কারুর আবার গীতা দে-র মত কোমল স্বভাবের গৃহিনী। পরীক্ষার খাতায় এত নম্বর পেয়ে কি হল! অঙ্কটা ঠিক মিলল না তো স্যার! আমি আজ USA-র সিটিজেন, ঘর-সংসার, ছেলে-মেয়ে, দামি বাড়ী-গাড়ী নিয়ে বহাল তবিয়ৎ-এ কিন্তু খুব গুমরে আছি। কাজের

সূত্রে কত ট্রাভেল করি, ফ্যামিলি নিয়েও দেশে-বিদেশে ঘুরি। আজ আমার একটা ক্লাস আছে। অবশ্য আমি ছাড়া বিশেষ কেউ আমার ক্লাসে পাত্তা দেয় না। তবু সত্যি কথা বলছি, আমি নিজেকে আজ একটু বিদেশী টাইপ ভাবি – বিদেশীরা অবশ্য আমাকে দেশীই ভাবে আর দেশীরা গুলিয়ে ফেলে। তবে আমি এসবে পাত্তা দিই না। আমি আজ 'পাসপোর্ট' কে 'প্যাস-পোর্ট' বলি, 'মাস্ক' কে 'ম্যাস্ক' বলি কিন্তু আমার ইংরাজীতে ভারতের প্রদেশের জেলাস্তরের পর্যন্ত খুব টান আছে। আজও ইংরাজীটা বড্ড বাজে বলি তবে ভাষাটা শিখতেও চাই না আবার জোড় করে বলতেও ছাড়ি না। তাই 'I mean', 'you know', 'kind of' এসব filler ছাড়া sentence শেষ করতে পারি না। তবে সে সব নাটক যাই থাকুক বাবা যদি কেউ Green card বা US Citizen না হয় আমি Indian দের খুব একটা পাত্তা দিই না। Class-এ না match হলে boss আমার অন্যদের কেমন sub-standard লাগে। কাজের জগতে আমি বেশ successful – যেমন ছোটোবেলা থেকে শোনা সেই ভালো ছেলেদের মত। অফিসে আমি বেশ ডাকাবুকো তবে বুকের পাটা ওতটাও বড় নয় যে বাড়ীতে বৌ-এর সামনে বেশী উঁচু গলায় কথা বলতে পারি। তাই বাড়ীর ঝালটা পারলে অফিসে মিটিয়ে নিই, junior-দের ওপর। অবশ্য অফিসে বা বাইরে কোনো সুন্দরী মহিলার সাথে একটু কথা বলার সুযোগ পেলে মনে হয় ভগবান আজও আছে। রাগ-রোষ টা একটু কমে। ভাগ্যিস পড়াশুনাটা করেছিলাম – না হলে কি এই উষ্ণতাটুকুও পেতাম! তবে সত্যি কথা বলছি ভাই – office-এ আমি Boss কে খুব তেল মারি আর নিজের উন্নতির জন্য একটু-আধটু কাউকে ল্যাং দেওয়া বা politics করাকে আমি খারাপ বলে মনে করি না। Let's be practical – survivor of the fittest ইয়ার! এখানে ethics টেনে কি লাভ – কে টানবে ethics-এর boundary?

অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরলেও আমার দুনিয়াটা বেশী বড় নয়। প্রচুর facebook friend কিন্তু face value তে কারুর কথা নেওয়া যায় এমন মনের মত friend খুব কম। মদ-মাংসে ভরা পার্টির শেষ নেই তবে কাজ-কর্ম, একটু গান-টান আর সাংসারিক বা পরচর্চা মূলক আড্ডার বাইরে বেশী কিছু কথা হয় না। কাজের বাইরে ঘর-সংসার, দেশ-বিদেশে family trip – ব্যাস। দেশে আজকাল খুব একটা আর যাওয়া হয় না। তবে দেশের ব্যাপারে আমি এখন একটু বেশী critical। অবশ্য কিছু টাকা পয়সা দান-টান করি মাঝে সাঝে দেশের বা নিজের স্কুল-কলেজের কোনো কাজে। । অভাব তো প্রায় কিছুরই নেই – মনের অভাবটা একটু ছাড়া। স্কুল-কলেজের টিচার-দের সাথে connection আগেও ছিল না, আজকাল whatsapp গ্রুপ হয়েছে পুরনো বন্ধুদের কিন্তু অধিকাংশের থেকেই অনেক দূরে চলে এসেছি। বড্ড একা লাগে মাঝে মাঝে, খারাপও লাগে। সময়ের স্রোতে ভেসে যাচ্ছি শুধু – এমন ভাবেই কি ভালো ছেলেরা থাকে! ছোটোবেলার সেই ভালো ছেলেরা সাড়া পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তবে এমন ভাবেই অধিকাংশেরা আছে বোধহয়...

****

সেবার টুটুল আর আমি দেশে যাচ্ছি। বড় দুই ছেলেকে সঙ্গে নিলাম না কারণ তারা তাদের বাবার সঙ্গে থাকতে পারবে। তাছাড়া তাদের সামারের ছুটিতে অনেক রকম প্রোগ্রাম থাকে। ছোট ছেলে টুটুলকে একা বাড়ীতে রাখা যায়না তাই আমি সঙ্গে নিয়ে গেলাম। রাত আটটায় প্লেন, পাঁচটার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। এনার তো সবেতেই তাড়াহুড়ো, সবসময়েই তাঁর প্লেন ফেল হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক ছোট ছেলেকে নিয়ে যেতে হবে এতটা রাস্তা তাই আর কোনও বাকবিতণ্ডার মধ্যে ঢুকলাম না।

আমরা দুজন ভেতরে ঢুকে যাবার আগে পর্য্যন্ত টুটুল তার বাবার হাত ধরেছিলো, এখন হাত ছেড়ে যেতে হবে বলে চোখে তার জল এসে গেল। তবু বাবাকে হামি দিয়ে সে শান্তভাবেই ভেতরে ঢুকল। যথাসময়ে প্লেনের ভিতরে ঢুকে নিজেদের সীটে বসলাম। অনেক লম্বা রাস্তা কিন্তু টুটুল সঙ্গে থাকাতে আমাদের সময়টা ভালোভাবেই কেটে গেল। পাশে একটা বদ্ লোক বসেছিলো, টুটুলের সঙ্গে খুব ভাব জমাতে চেষ্টা করে যাচ্ছে, বাংলাতে কথা বলছে দেখে টুটুলের খুব ভালো লেগে গেছে। বাপের বয়সী একটা লোক পেয়ে টুটুল বাপের সাময়িক অনুপস্থিতির ব্যাপারটা ভুলে গেছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি লোকটার নজর আমার দিকে।বদ্ লোকদের উদ্দেশ্য বুঝতে বেশী দেরী লাগেনা। যাইহোক একসময়ে টুটুল ঘুমিয়ে পড়ল। লোকটা আমার সঙ্গে ভাব জমাতে বিফল মনোরথ হয়ে মুভি দেখায় মনোযোগ দিল। প্লেনে লম্বা জার্ণি করে আমরা কলকাতা পৌঁছালাম, বাড়ী গিয়ে দুজনে অল্পকিছু খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম। দুতিন দিন চলল আমাদের জেটল্যাগ। তারপরই বাড়ীর লোকদের ব্যাস্ত রাখায় টুটুল মনোযোগ দিল।

সবাই খুব আদর করছে, কোলে নিচ্ছে, টুটুলের খুব ভালো লাগছে। বয়স ৬ বছর হলে কি হবে, এই টিংটিঙ্গে রোগা। কোলে নিতে কারোরই কোনও অসুবিধা নেই। সকলের একটাই প্রশ্ন, ওদেশে থেকে এত ভালো আবহাওয়াতে থেকে এত রোগা কেন? সে যে কিছুই খেতে চায়না কি করে বোঝাবো। এদিকে এখানে তো ভাত মাছের ঝোল দিব্যি গপ্ গপ্ করে খেয়ে ফেলছে। বাড়ীতে ছোট দাদুর সাথে খুব ভাব হয়েছে। ছোট দাদু হচ্ছেন টুটুলের বাবার ছোটকাকা। উনি হচ্ছেন বামন, মানে প্রতিবন্দী, কিন্তু বাড়ীর সকলেরই খুবই প্রিয় মানুষ।আমাদের ঘুম ভাঙ্গে রোজ তাঁর বাথরুমে মুখ ধোওয়ার বিরাট গলা খেঁকুরির আওয়াজ শুনে।

এই ছোটদাদু টুটুলের খুব প্রিয় বন্ধু হয়ে গেল। এক হচ্ছে ছোটদাদুর আর টুটুলে শারিরীক উচ্চতা সমান, টুটুল দাদুর কাঁধে হাত রেখেই চলতে পারে। তার ওপর দাদু সকাল বেলা থেকেই বলতে থাকে, "যা ইস্কুলে যা, ফরস্ না ক্যান, ফরতে বস ফরতে বস"। প্রথম দিকে টুটুল ছোটদাদুর বাঙ্গাল ভাষা বুঝতে পারত না, কিন্তু দুচারদিনের মধ্যেই দাদু আর টুটুল বেশ ভালোই কথোপকথনে রপ্ত হয়ে গেল, একজন বাঙ্গাল ভাষা বলে আর একজন ইংরাজী।

বাড়ীতে অনেক গাছপালা আছে, সেগুলির দেখাশুনা ছোটদাদুই করে থাকেন। অনেক পেয়ারা গাছ আছে, পাড়ার ছেলেপিলেরা সুযোগ পেলেই গাছে উঠে পেয়ারা খায় কিংবা চুরি করে নিয়ে যায়। দাদুর একটা ছোট লাঠি আছে, দাদু সেটা হাতে নিয়ে হাঁক দিয়ে ছেলেগুলিকে তাড়া করেন। টুটুল একটা খেলা পেয়ে গেল, দাদুর হাত থেকে বেঁটে লাঠিটা নিজের হাতে নিয়ে দাদুকে বলে দিল ইংরাজীতে যে ঐ ছেলেগুলোকে সে সায়েস্তা করে দেবে। দুজনে মিলে বাইরের বারান্দায় পাহাড়ায় বসে গেল। ছেলেগুলো গেটের কাছে আসলেই টুটুল লাঠি হাতে ইংরাজিতে বকাবকি করতে করতে

ধাওয়া করত গেট অবধি কিন্তু গেটের বাইরে কখনই যেতনা কারণ সে জানত মা বাইরে যাওয়ার পারমিশন তাকে দেয়নি।

ওমা, পরেরদিন রিণি দেখে পাড়ার ছেলেগুলি সব বাড়ীর ভেতরের মাঠে বল খেলছে আর টুটুল তাদের লীডার। ছোটদাদুও চুপ করে বারান্দায় বসে তাদের খেলা দেখছে। টুটল তাদের সঙ্গে ইংরাজীতে নির্দেশ দিচ্ছে আর তারাও ঠিক্ ঠাক্ সেইমতোই খেলা করছে। ভাষা হলো উন্মুক্ত, কখনই বাচ্চাদের খেলার প্রতিবন্দক হতে পারেনা।

দুদিন পরে আমরা জায়েরা আর বাড়ীর বড় মেয়েরা মিলে বেলুড় মঠে গেলাম। গাড়ী ভর্তি মেয়ে একমাত্র টুটুল আর ড্রাইভার পুরুষ। টুটুল তো আনন্দে আত্মহারা, ওর খুশীর সীমা নেই। আমার জায়েরা লুচি তরকারী করে নিয়ে গিয়েছিলো, টুটুলকে দেবলা দেবলা করেও একটা মিষ্টি দিয়ে দিলাম, সবাই বলল কিছু হবেনা ভাল দোকান থেকে মিষ্টি কেলা হয়েছে। টুটুল মিষ্টি খায়লা এমনিতে, মুখে দিয়েই ফেলে দিল। আমি সঙ্গে করে ক্যাডবেরী নিয়ে গিয়েছিলাম। সেইগুলো টুটুল আর মেয়েদের দিলাম। তারপর আমরা রামকৃষ্ণদেব স্বামীজীর মুর্তিকে প্রণাম করবার জন্য ভেতরে যাব ঠিক করছি এমন সময়ে একটি ১১/১২ বছরের ছেলে একটা ছোট বাঁশে লাগানো বেলুনের ঝুমঝুমি বিক্রি করতে এল। অমনি টুটুলের বায়না শুরু হয়ে গেল ঐটা কিনে দিতে হবে। দাম হচ্ছে আড়াই টাকা। আমার জায়েরা ছেলেটার সঙ্গে দরাদরি করার চেষ্টা করছিল, আমি বাধা দিলাম। টুটুল ওসব দেখতে অভ্যস্ত নয়। আমার কাছে খুচরো আড়াইটাকা ছিলনা। ছেলেটাকে বললাম তুমি সব টাকাটাই রেখে দাও। ছেলেটা রাজী হলনা সে আমাকে আড়াই টাকা ফেরৎ দিল। টুটল আর আমি ছেলেটার সততা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিশেষ করে টুটুল, সে ভেতরে যেতে রাজী হলনা। আমাকে বলল 'মামি তুমি যাও আমি রহিমের সঙ্গে থাকি'। ছেলেটা মুসলিম, তার নামটা টুটুলের জানা হয়ে গেছে। আমি সবাইকে বললাম ভেতরে ঘুরে আসতে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ওদের সঙ্গে। তার সঙ্গে দুমিনিটের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল টুটুলের অথচ কেউ কারোর ভাষা জানেনা। দেখি টুটুল রহিমের বেলুন বেচতে সাহায্য করছে।

পরের দিন ড্রাইভার আমাদেরকে আমার বাপের বাড়ীতে পৌঁছতে গেল, সঙ্গে আমার জ্যাঠাতুতো ননদ গেলেন।বিকেলবেলা আমার ননদ চলে গেলেন ড্রাইভারের সঙ্গে। সেখানে টুটুল তার মাসতুতো দাদাকে পেয়ে খুব খুশী, সে তার নিজের দাদাদেরই বয়সী। সারাক্ষন তার সঙ্গে এবং পেছন পেছন ঘুরতে লাগলো। আমার মার সঙ্গে টুটুলের ভাব বেশী কিন্তু আমার বাবাকে সে পছন্দ করলনা। বাবা পুলিশে কাজ করেছেন তাই তার মেজাজ একটু কড়া। টুটুল বাবকে পরিস্কার বলে দিল সে তাকে ভালবাসে না, তার যে দাদু আমাদের সঙ্গে থাকে মানে টুটুলের ঠাকুর্দা তাকেই সে বেশী ভালবাসে। টুটুলের ঠাকুর্দা কিঞ্চিৎ নিরীহ প্রকৃতির আর মুখবুজে নাতির সব অত্যাচার সহ্য করেন তাই তিনি টুটুলের বেশী প্রিয়।

আমাদের ফিরে আসবার সময় এগিয়ে আসছে ক্রমশ, আমার যতই মন খারাপ হচ্ছে টুটুল ততই খুশী কারণ ও তার দাদাদের, বাবা, দাদু যাকে সে বেশী ভালোবাসে এবং তার বন্ধুবান্ধবদের

সাথে আবার দেখতে পাবে। কলকাতায় ফিরে শুনলাম আমার বড় জায়ের মেয়ের বাচ্চা ছেলের মুখেভাত। ওখানে গিয়েই উঠলাম। মেয়ে জামাই কদিন পরে আসবে মুখেভাতের দুদিন আগে। এদিকে জায়ের বাড়ীতে ফাইফরমাস খাটবার একটা ১১/১২ বছরের ছেলে রয়েছে, তার নাম সুনীল। ব্যাস, টুটুনের বন্ধু জুটে গেল আবার। সারাক্ষন সুনীলকে ডাকাডাকি, ইংরাজীতে নির্দেশ দেওয়া চলছে। কিন্তু সুনীল তো এবাড়ীতে কাজ করে, তার তো টুটনের সঙ্গে খেলাধূলো করলে চলবেনা। টুটুনকে কেউ কিছু বলতে পারছেনা কিন্তু সুনীলে ওপর বকুনির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। আমি টুটুনকে বুঝিয়ে বললাম সুনীলের কাজ করার সময় ওকে খেলা করতে না ডাকতে। টুটুন তো বুঝতেই পারেনা বাড়ীতে এত লোক থাকতে সুনীলকে এত কাজ করতে হবে কেন? সবচাইতে কষ্টকর ব্যাপার ঘটল মুখেভাতের আগের দিন সুনীলকে বলা হল বাড়ী চলে যেতে কারণ মুখেভাতের জন্য অন্য লোক ঠিক করা হয়েছে তারাই সব কাজ করবে। টুটুন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সুনীলকে দেখতে না পেয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। সবাই বলছে সুনীল পরে আসবে। ক্রমে মুখেভাতের সময় হয়ে এল, আমার জা টুটুনের জন্য গরদের পাতামা পাঞ্জাবী কিনেছেন। সেটা পরে টুটুনও জায়ের বড় ছেলের সঙ্গে ভাগ্নাকে ভাত খাওয়াবে। কিন্তু তার মনের মধ্যে সুনীল বসে রয়েছে।

অনেক বেলা গেল, সব কাজ শেষ হলো সবার খাওয়া দাওয়া শেষ। টুটুন আমাকে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো সুনীলকে নিয়ে আসার জন্য। আমি তো জানিনা সে কোথায় থাকে। টুটন সকলকে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছে, ওর ধারনা আমাদের ড্রাইভার নিশ্চয় তার বাড়ী চেনে। কেউ টুটুনের কথা শুননলনা। রাত্রে বিছানায় শুয়ে আমার বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে তার কান্না সুনীলে জন্য, আমার বুকটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিলো। এত হৈ চৈ এত আড়ম্বর কিসের জন্যে, আমার নিস্পাপ সন্তানের অবোধ শিশু মনকে যন্ত্রনা দেওয়ার জন্য? আজ পর্য্যন্ত সেই ঘটনা আমি ভূলতে পারিনি।

একটি আত্মা দুটি দেহ

- কুমুদ রঞ্জন রায় 1961 CE

[আপনারা অনেকে পরমহংস যোগানন্দের " Autobiography of a Yogi" বইটি পড়ে থাকবেন। এই প্রবন্ধটির উৎস সেই বইটি। যোগানন্দের বাল্য নাম ছিল মুকুন্দ এবং পিতার নাম ছিল ভগবতি চরন ঘোষ। পিতা ছিলেন ভারতীয় রেলের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সেই সময় উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলীতে কর্মরত ছিলেন। মুকুন্দ ছোটকাল থেকে একটু যাযাবর প্রকৃতির ছিল। ঘুরতে খুব পছন্দ করত। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে, এখন গরমের ছুটি শুরু হয়েছে। মন উসখুস করছে কোথায় যাওয়া যায়।]

ডিনার টেবিলে মুকুন্দ বললো – বাবা, এই ছুটিতে একটু বারানসিতে বেড়াতে যেতে চাই। বাবা জিজ্ঞেস করলেন - কবে যেতে চাও। – পরশু দিন। বাবা বললেন – ঠিক আছে।

পরেরদিন অফিস থেকে এসে বাবা মুকুন্দকে তিনটি জিনিষ দিলেন – প্রথমতঃ দুটি রেলের প্রথম শ্রেণীর পাশ, একটি রায়বেরিলি থেকে বারানসি অন্যটি বারানসি থেকে রায়বেরিলি। দ্বিতীয়তঃ দিলেন কিছু টাকা, তৃতীয়তঃ দিলেন দুটি চিঠি - একটি চিঠি বন্ধুবর স্বামী প্রনবানন্দজীকে। তার বাবা ও প্রনবানন্দজী উভয়ই ছিলেন যোগীরাজ শ্যামাচরন লাহিড়ীর শিষ্য। এই চিঠিটি ছিল বন্ধুর কাছে ছেলের পরিচয় পত্র। দ্বিতীয় চিঠিটি ছিল তার বন্ধু কেদারনাথ বাবুর জন্য। বাবা বললেন - আমি কেদারের ঠিকানা জানি না। তুমি প্রনবানন্দের কাছে তার ঠিকানা পেতে পার। আর না হলে অন্য কোন উপায়ে তাকে চিঠিটি পৌঁছাবার চেষ্টা কোরো।

তারপরদিন সকালে ট্রেন ধরে দুপুরবেলা মুকুন্দ পৌঁছে গেল বারানসি। ভাবলো আগে বাবার চিঠিগুলো পৌঁছেদি, তারপরে বেড়ানো যাবে। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। এসে হাজির হল স্বামী প্রনবানন্দজীর বাড়ীতে। এসে দেখলো বাড়ীর সিংহ দুয়ার খোলা, জিজ্ঞাসা করার কোন লোক নেই। একটু ঢুকেই দেখলো একটা সিঁড়ি, উপরে উঠে এল মুকুন্দ। দেখলো – একটি বড় ঘর, তার এক প্রান্তে একজন পদ্মাসনে বসে আছেন। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ নিয়ে অতি সন্তর্পনে সেই ঘরে প্রবেশ করল মুকুন্দ। তারপর জিজ্ঞেস করলো - আপনি কি স্বামী প্রনবানন্দজী? পদ্মাসনে সমাসিন ব্যক্তি বললেন - হ্যাঁ আমিই সেই, তুমি ভগবতীর ছেলে না, এসো এসো আমি তো তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। অবাক হল মুকুন্দ - আমি তো বাবার দেওয়া প্রশংসাত্র এখনও তাকে দেইনি, তবে উনি আমাকে চিনলেন কি করে?

তা'সত্বেও বাবার দেওয়া চিঠিখানি প্রনবানন্দজীকে দিলেন। তিনি চিঠিটা হাতে নিয়ে পাশে রেখে দিতে দিতে বললেন – আমি অবশ্যই কেদারনাথ বাবুকে চিনি। দেখি, উনি যদি এখানে এসে তার চিঠিটা নিয়ে যেতে পারেন । মুকুন্দ আবার অবাক হল - আমিতো তাকে কেদারনাথ বাবুর চিঠির কথা বলিনি, তবে উনি জানলেন কি করে?

স্বামী প্রনবানন্দজী বলে চললেন – জানো মুকুন্দ, আমি তোমার বাবার অধীনে রেলে চাকরী করতাম। এখন আমি দুটো পেনশন পাই - একটা রেল থেকে আর একটা ভগবানের কাছ থেকে। মুকুন্দ বালকসুলভ প্রশ্ন করলো – ভগবান কি আকাশ থেকে টাকার থলি ফেলে দেন? হো হো করে হেসে উঠলেন প্রনবানন্দজী, বললেন - না না উনি টাকার থলি ফেলেন না, তবে উনি আমার উপরে শান্তিবারি বর্ষন করেন।

এই কথা বলতে বলতে প্রনবানন্দজী একটু থেমে গেলেন, তার মুখে আর কোন কথা নেই। তার শরীর যেন আস্তে আস্তে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে গেল, দৃষ্টি যেন সুদূর প্রশারী। শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন কিনা তাও বোঝা যচ্ছে না। সেখানে শুধু দুটো প্রাণী, চারি দিকে নিঝুম নিরবতা। হঠাৎ মুকুন্দর দৃষ্টি পড়ল তার বেদীর সামনে কাষ্ঠনির্মিত পাদুকা দুটির দিকে আর অবাক হয়ে ভাবছে – কি হল প্রনবানন্দজীর। এভাবে প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল। তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলেন প্রনবানন্দজী এবং বললেন – মুকুন্দ, আমি কেদারনাথ বাবুকে খবর দিয়েছি, উনি এখানে আধঘন্টার মধ্যে চলে আসবেন।

কিছুক্ষন পরে মুকুন্দ প্রনবানন্দজীকে বললেন - আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। মুকুন্দ রাস্তায় এসে দাঁড়াল। অল্পক্ষন পরে মুকুন্দ দেখলো একজন ক্ষীনকায়, কর্সা, মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ব্যক্তি এদিকে আসছেন। মুকুন্দ তাকে জিজ্ঞেস করলো - আপনি কি কেদারনাথ বাবু। আগন্তুক বললেন - হ্যাঁ আমি কেদারনাথ এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ভগবতীর ছেলে? আমি তো তোমার বাবার চিঠি নিতে এসেছি।

- আপনি জানলেন কি করে যে আমি এখানে এসেছি – জিজ্ঞেস করল মুকুন্দ।

- প্রায় আধ ঘন্টা আগে আমি দশাশ্বমেধ ঘাটে কেবল স্নান করে উঠেছি, দেখি সামনে দাঁড়িয়ে প্রনবানন্দজী। সাদা কাপড় পরিহিত, পায়ে কাষ্ট-পাদুকা। আমাকে বললেন – কেদারবাবু, ভগবতীর ছেলে আমার বাড়ীতে এসেছে। ভগবতী ছেলের মাধ্যমে আপনাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। আপনি কি একবার আমার বাড়ীতে আসতে পারবেন? আমি বললাম – হ্যাঁ, আমি বাড়ী গিয়ে জামা-কাপড় পড়ে আধ-ঘন্টার মধ্যে চলে আসবো। তারপর উনি চলে গেলেন, এবং এখন আমি আসছি।

- আচ্ছা কেদারনাথ বাবু, আপনি কি সত্যি স্বামী প্রনবানন্দজীকে দেখেছিলেন? আমিতো এখানে দুপুর থেকে বসে আছি, উনি তো কোথাও যাননি। এই কথায় একটু উস্মাপ্রকাশ করে কেদরবাবু বললেন - তুমি কি বলতে চাও? আমি প্রনবানন্দজীকে অনেকদিন ধরে চিনি এবং উনি কেমন দেখতে তাও আমি জানি। মুকুন্দ আবার বললো – কিন্তু কেদারবাবু আমি তো এখানে দুপুর থেকে বসে আছি, আমি তো ওনাকে এ স্থান ছেড়ে যেতে দেখিনি। তখন কেদারবাবু বললেন – আমি প্রনবানন্দজীকে অনেকদিন ধরে জানি, উনি সর্বদা সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন। আমি আগে শুনেছি যোগীরাজ শ্যামাচরন লাহিরী মহাশয় কাশীতে থেকেও সশরীরে কোন কোন বিশিষ্ট শিষ্যের বাড়ীতে গিয়ে দেখা দিতেন। এখন দেখছি প্রনবানন্দজীও সেই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন।

এই কথা বলতে বলতে তারা এসে প্রনবানন্দজীর ঘরে এসে ঢুকলেন। কেদারনথবাবু বললেন - প্রনবানন্দজী

যখন দশাশ্বমেধ ঘাটে আমার সঙ্গে দেখা করেন, এখন যে সাদা কাপড়খানি পড়ে আছেন, তখন সেই কাপড়খানি পড়েছিলেন এবং ঐ যে কাষ্ঠনির্মিত পাদুকা দুটি দেখছো, সে দুটিও তার পায়ে ছিল। তারপর কেদারনাথ বাবু প্রনবানন্দজীকে নমস্কার করে এসে বসলেন। মুকুন্দ তার পিতৃদত্ত চিঠিটি কেদারনাথ বাবুকে দিলেন। কেদারনাথ বাবু চিঠিটি পড়ে পকেটে রেখে দিলেন।

আরো কিছুক্ষন কথাবর্তার পর কেদারনাথবাবু বিদায় নিলেন। মুকুন্দও তাকে অণুসরন করে নিচে নেমে এলো। তখন কেদারনাথবাবু বললেন – মুকুন্দ, তোমার বাবা আমাকে কোলকাতায় রেলে একটি চাকরীর প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি খুবই আনন্দিত, কিন্তু এসময়ে আমার পক্ষে কোলকাতায় যাওয়া সম্ভব নয়। আমি এখনও একই সময় দুটি দেহ ধারন করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারিনি। আমি তোমার বাবাকে পত্র দিয়ে জানিয়ে দেব।

SAFARI

From Anandini Mukherjee, *daughter of*

Haimanti Paul, 2006 EE
Amalendu Mukherjee, 2006 MET

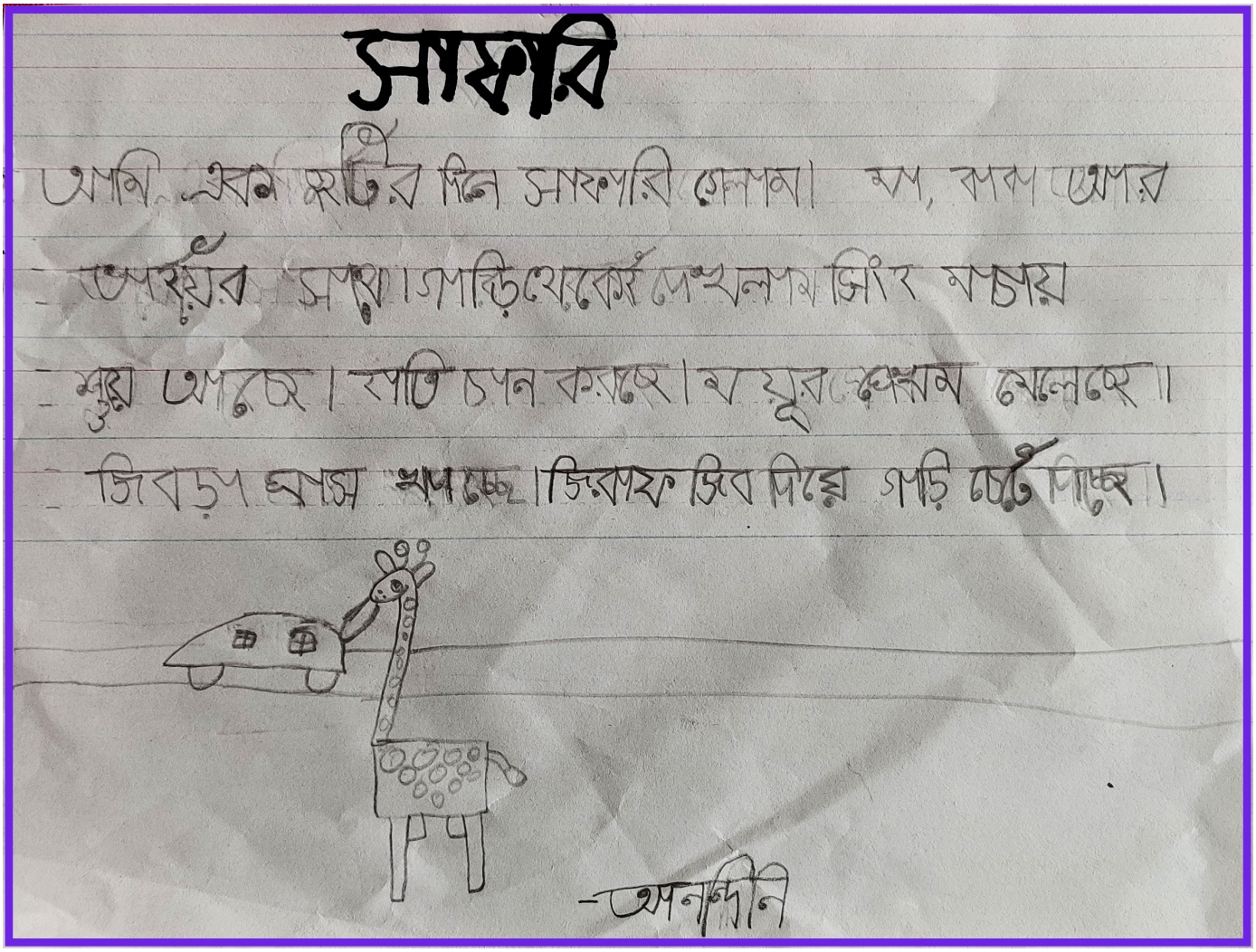

নদীর নাম মা

সৌমি জানা *(Spouse of Niloy Jana, 1994 CST)*

আমার দেশে একটা নদী
নদীর নাম মা
সেই উৎসকাল থেকে
তার খাতে বইছে
শীতল মিষ্টি পানী
বাঁকে উদ্বেল ফেনিল স্নেহভার
মা নদীর বুকে ছোট ছোট ডিঙি ভাসে
বহু পসার বহু যাত্রীর পারাপার দিনভর
কখনো দুপাশের পার ভাঙে ভীষণ ঝড়ে
পাগলা হাওয়ায় ঘূর্ণি হয়ে মাথা কুটে জল

তবু বয়ে চলে মা নদী
ঝড় সামলে আরো শান্ত স্থিতধী
বুকে নিয়ে পারভাঙা ধ্বংসচিহ্ন
বহু ভাঙাগড়ার সাক্ষী
মা নদীর চড়ে জমে পলি
মসৃণ, উর্বর ,সভ্যতার লালনভূমি
অচিরেই বল্গাহীন উন্মাদনা
দুই তীর মুখরিত ক্ষমতা, গর্ব, সম্পদ
মা নদীর বুকে শিহরিত মৃদু স্রোত
গর্ভে অপরিচিত আশঙ্কা
সভ্যতার যাবতীয় পরিত্যক্ত অপ্রয়োজন
অনায়াসে এসে পড়ে নদীবক্ষে বাধাহীন
সভ্যতার দায়ভার নীরবে বহন করে মা নদী
ক্লান্ত , শ্লথগতি , উচ্ছ্বাসহীন

একদিন পথশেষে মিশবে
সাগরের গভীর অতলান্তে
ভূখণ্ডের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে
অবশেষে থামবে গতি সীমাহীন নীলে
মোহনার পথে শুধু অপেক্ষা
বিদায় বেলায় যদি মেলে
ফেলে আসা সভ্যতার হাতছানি
ফুরিয়ে যাওয়ার কালে কি ভীষণ মায়া
আর বুকভরা দীর্ঘশ্বাস মা নদীর
হয়তো একটিবার, শেষবার।

Pandemic Pet

Rohan Chowdhury, son of Auyon Choudhury 2001 CE

Sometime in the middle of April 2021, I went to a friend's house who had just gotten a pet dog. However, they were not going to keep him because her mother was afraid of dogs, and so they decided on selling him. When the news came to us, we were thrilled - well at least I was. My father had approved this decision, however, my mother opposed this decision because she thinks the dog will cause a giant mess in the house. I replied that it will help me to spend my time during the pandemic period. On a Friday night, we arrived at my friend's house to purchase the dog. He was a small black labrador mix puppy, just 8 weeks old.

We kept the puppy in our house from Saturday. We would play with him, feed him, take him for pee/poo walks, and put him gently to sleep in the afternoon. That month I had the state test for school and my parents would not let him distract me while studying. For this, we would take him back to my friend's house at night. After the school tests ended, we started to slowly adapt ourselves to having a pet. We bought him a food and water table, a small dog cage, a playpen, a few toys, doggie bags and a new harness and leash. I had slowly gotten used to this and even gave him a name, Jeffy. Whenever I had a bad day at school, I would always come back and see him wake up from his nap and jump at me and made me feel satisfied.

Jeffy changed our lives and became an integral part of the family. Due to the pandemic, my family and me spent most of our time with Jeffy, this helped to make a smooth transition for the newest member of the house.

He was like my brother who would always be with me. After my summer camp this year, Jeffy was on his leash running to me at my summer camp arrival spot which got me excited. I played with him every day and sometimes took him for morning walks. Jeffy helped me get through the bad age of the pandemic and other dreadful moments like bad days at school, family bereavement etc. We got so used to him that we gave him funny and cute nicknames like Hoku, Jeffu, etc.

This helped me learn that a pet is something that can help me get through dreadful moments namely COVID.

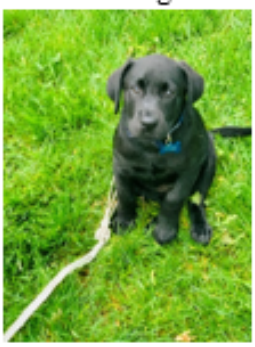

Hope

Soumyanil Jana *(Son of Niloy Jana, 1994 CST)*

"Mom, look at the newspapers," I called.

"Yeah, coming. I'll read it," she called back. You might be wondering, what could possibly be in the newspapers that would be necessary to call my mom to read it, instead of leaving it for herself? Well, in my town, there has been this mysterious disease that remains unknown as to how it popped up. So far, more than a thousand people have been exposed to it, and out of those people, about one-fifth of them passed away. If I remember correctly, it popped up only a week ago. Recently, more info has been shared. This supposedly *mysterious* disease has now popped up more in my school.

"That is sad. Now it is spreading in school. Well, be careful, Aaron. You can't get sick like the others. It's imperative you be clean, such as washing hands. I'm confident you know that. Just be more watchful of doing so, and I'm sure you'll be fine," my mom then said.

"Sure, thing," I lastly replied. I then played video games. Not really worrying about *that* thing, I walked up into my room, turned on my PC, and started playing my favorite video games.

Sometime later, I decided to go for a bike ride.

"Seeya, mom!" I told her. Then, with speed, I head off to the neighborhood roads, not worrying about anything. I relax, as the subtle wind blows on me. After riding my bike, coming back home, thinking that I was safe and sound, weird things started happening to me the next day.

Why is my head hurting so much? I wondered. I was getting up, or trying to, at least. I just couldn't get myself up, because of this pain-in-the-neck headache I had. Suddenly, my headache started aching more. I started groaning softly, and then as the pain progressed, so did my groan. Eventually, I got to the point where I was groaning so loud, I made my mom come in to help me.

"What is going on, dear? Are you okay? You are being like a megaphone?" my mom asked, out of worry.

"Sorry, mom. I'm seeming to have a headache, and it's a very painful one," I unclearly replied. I was hurting too much to even talk properly and clearly. My mom then started jumping into conclusions.

"You can't possibly have that disease, could you? Oh no, I need to immediately do something about it. I know I should just calm down and just give you some relaxing treatment, but considering what environment we are living in right now, I need to make sure you are safe. I'm going to call the doctor, so stay in bed. I can't have you walking around with your intense pain." *There is no possible way I could've-* but before I passed out, *cough, cough. Sniffle. Now, as I was saying, there is no possible way I could've got that mysterious disease. I was careful.* Meanwhile, while I was thinking about the state I was in, mom, in another room, was speaking to the doctor, with the voice of an afraid person.

"Doctor, my son has gotten sick starting today, just now, from what I've seen. So far, all I've seen is sniffling and dry coughing, but I'm really worried if he got *that* disease."

"Alright, ma'am, what is your son's name?"

"His name is Aaron Rose."

"A-a-r-o-n, right? And then, obviously R-o-s-e."

"Yes, doctor."

"Alright, call me later if you notice any other symptoms that aren't related to the symptoms you described just now. You just found out your son is sick, which is why I am advising you to watch Aaron carefully. By you doing this, we can figure out if he really has that strange disease going around this town."

"Okay, I will call you later. Bye, and I hope you stay safe."

"Alright, hit me up."

I really need to analyze my son more, with caution, from now on. I can't have him be in complete danger. Well, he already kind of is, but still. I really don't hope he has that strange disease that popped up. But, if he did, then I'm going to be devastated. Let's hope for the best.

Later on, my mom checked me out a lot. She was like checking on me more lately. Very unusual, I must say. Was she supposed to check on me more, because the doctors said so? I didn't question, since something tells me the doctors said so, because of the fact that she doesn't check on me a lot usually. But, one thing I have to say, I've been getting stranger. For example, I didn't have any taste from the food that I eat, which is not the average thing that happens when you get sick. I've been getting tired also. This really isn't the average sickness at all. Could this really be the *mysterious* disease that is making me unable to get the taste of my tasty food, and the thing that causes me to get tired a lot. I've also been having trouble breathing a bit. Could this be the end of me? After my mom did her job as a security camera for me, she went to a room, picked up her dark phone, and decided to call a certain someone, which is the doctor. "Doctor, I really need to tell you something," mom said, with seriousness.

"Yeah, what is it? By the way, call me Dr. Linda," the doctor responded.

"My son also has symptoms such as fatigue, no taste, having trouble breathing, and nausea? I don't think this is the typical cold or fever?" The doctor was speechless. She was silent, as if it was a dark and quiet nighttime, and was too afraid to say what she was going to say. Later, with trembling, she said,

"I'm afraid I need to tell you something very devastating. Your son has *that mysterious* disease. The symptoms you told me just now are connected with the symptoms you get from that virus. Other people who got this disease also had the same symptoms. I'm genuinely sorry to tell you this. I feel extremely bad for you. All you can do is hope for the best." The call ended, and my mom was devastated. She was silent, taking in the pain she got from the news. She then gradually broke down, resulting in a waterfall that consisted of tears.

Not too long after, my mother approaches me, with a gloomy expression. With that same expression, she stuttered, "Hey there, Aaron. I really need to tell you something." I wasn't ready to hear what she was going to say, considering her expression is dark as heck. I anyways replied with a. "What is it, mom?"

"I thought you were just sick and had some cold or something, but...you have more than just a cold. Y-you have more than just a fever as well."

"Mom, just spit it out!"

"Honey, be patient! Anyways, you have *that disease*." When I heard those last two words of the sentence, I was devastated. I didn't want to die! Is this a curse? Was I supposed to get that thing as a punishment? What did I do to deserve such a thing! I wasn't crying, like my mother when I heard the news, but I was definitely devastated and afraid. I genuinely didn't want to die.

As each day passed, II became more afraid. Suddenly, I started to cry, out of fear. I still had the thought of, *NO I DON'T WANT TO DIE!* In my head. This mysterious disease doesn't even have a cure yet, and my mother is telling me to hope for the best, but I just can't. How can I hope for the best outcome when literally I have a disease that doesn't even have a cure yet, and is mysterious? Just how can I possibly hope for the "best"? This disease at a fast rate spread throughout the town in the course of over a week, tagging more than a thousand people, and one-fifth of those same people died thanks to it. In fact, a lot of people in this town still get the case per week. It's unbelievable how such a *mysterious disease* can infect a lot of people in such a minuscule amount of time, like he's the bacterial version of Reverse Flash. Wait, that was a corny comparison, but you get what I'm saying. I have heard it so many times to "always have hope". Yeah, be optimistic and all, but how for this? It's not going to get better anyway if I keep complaining about hope. Since then, I started losing my spirit. Usually, I would go outside, and breathe the fresh outside air, or play video games when I have my free time. I would also be the one person with the most amount of energy. But that wasn't the case. I didn't go outside, obviously because I can't spread *that disease* to others, but strangely, I wouldn't be playing video games that much. For me, whenever I get sick, I try my best to get as much video game time as I can, with of course, resting and other stuff. This time, I don't feel like doing that type of stuff. I'm simply not in the mood at all. I lost part of myself, which was my enthusiasm. I felt like a boring, tired person, with no energy to do the stuff I want to do. I felt like an old hag who was unable to do the things it could do when it was younger. This was a pain. Even how I act changed. I went from a person who is patient, and kind of nice, to a person who is always grumpy and rude. For instance, when my mom asked me to come down for dinner, instead of me saying,

"Okay mom, I'm coming a bit later. I don't feel that hungry right now.", I rudely bursted out, "My, god, mom, why do you have to be such a nosey person? Worry about yourself! I'm not hungry now! Don't disturb me for god sake!" I really shouldn't have said it like that. I couldn't control myself to say it calmly. She didn't do anything to deserve such an attitude. I was too frustrated. Ever since I heard about the news, I lost hope, I turned very pessimistic, and lost my spirit. I am fearful of death, because this disease has killed a lot of people in this town. I couldn't keep control of myself. It's like I'm drastically changing. Not like, but literally.

One day, my mom called me.

"Hey, Aaron, we need to have a talk," she said, with a serious voice. Whenever my mom says those words like that, instead of it being something excited, it is something serious. I get a bit spooked whenever I hear those words with that voice.

"'Kay mom, I'm coming," I replied. Is my mom going to scold me because of my changed self, with my rude attitude? Is she going to take away my video games? What could she possibly say? Could she give me a lecture about how my sickness is not an excuse for this? What could it be? I anyways come to where my mom is. *Inhale, exhale*, my mom breathed.

"Son, I know it has been a really hard time for you, ever since you became sick. But, when I told you the news about the fact that you got *that mysterious disease*, you changed ever since, from what I can see. Where is my *usual* you? I want you to be honest, and talk to me. I'm not mad by any means." Alright, she won't be mad, but she will definitely make me feel ashamed of myself. Something tells me that her plan is to give me a long lecture that is so strong, it can make me feel disappointed at myself. This is why it took a while for me to clearly speak out my truthful thoughts.

"How does it feel to know that you have a chance of dying? Seriously, look at the news and statistics of this awful thing! When we first heard about it, thousands got this case, and one-fifth of those people passed away! What's even worse is that it doesn't have a cure yet. How am I supposed to be confident that I will survive if there isn't any such thing as a cure?"

"You know that diseases with no vaccines to counter them can somehow be properly countered without them? It could happen to you, just by you extremely taking care of yourself, properly. Just hope for that. Besides, have hope that the vaccine for this disease will come as soon as possible. Hope for the best."

"Mom, this leads me to the remaining question, which is how can I hope for the best? How can I possibly hope for the best!? How do I 'extremely and properly' take care of myself and make the vaccine go away!? Are you living in a fantasy or something? Plus, vaccines take a lot of time to make!"

"Well, hope that the perfect vaccine will be made by the best doctors in a short amount of time. Plus, do the usual ways of taking care of yourself, such as taking a shower, washing hands, being clean overall, take the right foods, and more!"

"What if it doesn't work!?"

"Well, you should hope that it works to begin with. It's not going to help you if you don't have hope, Aaron."

"I'm tired of this whole 'hope' thing. So annoying, Jesus Christ!"

"I understand that you are afraid to die. Most of us are afraid to die. I am even afraid to die. Speaking of which, I am afraid that you could die. But I'm right now hoping for the best. I'm hoping that you still stay alive, even though you have *that mysterious disease*. I understand why you act like this. If I were in your shoes, without a doubt I would act the same way. But you shouldn't worry about you only dying, because other people are having the same situation that you have. You're not the only one suffering from the fear of dying, for instance. But some of those people, at the same time, have the hope to hope that they stay alive. You are Aaron, a person who is always energetic, and optimistic. Please stop fading away from who you are." My mom started shedding some tears. After I saw those tears, I genuinely felt different. *Could this hope really help me?* I thought. I felt so bad that my mom had to suffer from the fact that I have a

fearful thing inside me, messing with me, trying to make me eventually die. I walked away, and that was that

Over the course of the next few days, and weeks, I changed myself. I decided to hope. Suddenly, we got mail. It was news. I saw the first page of the white, colorful paper, and here is what I found: "A Perfect Vaccine has been finally invented! Recently, a new vaccine has been tested out on some people with the *mysterious disease*, and the tests were successful. The people who got tested successfully had been cured from *that disease*, according to the doctors. Don't worry folks. Your suffering and fear is over!" I was screaming with joy, and crying at the same time, and my mother was tearing with joy as well. *Looks like it worked. Hope really does work!* I thought. "See!? What did I tell you? Have hope!"

"You don't have to tell me mom!" I laughed.

"Well, let's go get the vaccine! I'm going to make an appointment for today! Get ready!"

"Alright, mom!" I replied, with happiness. We went outside half an hour later, to start the car, and get the vaccine. After that, I started feeling better the week after that day. "Well, we're back at it again!" I said, "Old me is back!"

From Santanu Chakrabarty 1994 EE

One great life, Dipak Ghosh (BE College batch 1993, CE)

Many people know about the orphanage of Rahara Ramakrishna Mission. Dipak Ghosh, a student of that ashram, is a moderate and smiling boy from an early age. While other friends were busy with childish fascination, Dipak was obsessed with an indomitable desire to get out of his adversity.

The school boundaries are crossed with good enough results. He then went to Shibpur to do BE and then Masters in Kanpur IIT. After that, he joined PWD of West Bengal and gradually secured the post of Superintendent Engineer. And unlike other boys, Dipak, who excelled in his studies, dreamed of joining the Ramakrishna Mission as a monk. Just as he grew up under the umbrella of Ramakrishna Mission, so he wanted to be the support of many others.

With that dream in mind, he established "Beldiha Sri Ramakrishna Ashram" (https://www.beldihasra.org/) at Go-Ghat, Block 2, Fului Shyambazar, in the outskirts of Hooghly, West Midnapore and Bankura District, to look after several orphan boys. He dedicated his entire life, to the welfare of underprivileged society, after fulfilling the duty of his professional service as an efficient Civil Engineer. When asked about his activities, he used to talk about the 'Beldiha Ashram' in a very simple way, with an immortal smile like a child. There was no pride to say this or any pressure to ask for a donation.

We, his childhood classmates, who are wandering around in the whirlpool of daily worldly desires, are thrilled to know that one of us can rise above everything and think like this for society. That's when we decided to visit his ashram one day and witness everything.

Finally, we, some of his old classmates came to Beldiha Sri Ramakrishna Ashram. This place is near Kamarpukur. The mind was fulfilled, to see the clean ashram decorated with beautiful trees. Dipak was very happy to have us! We saw the temple, hostel, monk's quarter, guest house, cowsheds, fields, playground, pond, computer training centre, charitable clinic. It's amazing to have such a wide range of activities within such a limited area.

The head bows down automatically. We could realize, how a person like Dipak becomes extraordinary from ordinary us. His classmates easily could bend down to touch his feet with great reverence.

What kind of power does Covid have to fade the brightness of such a "Dipak" (which means lamp in Bengali)? Even though his mortal body was destroyed, Dipak became a real lamp with his great life. Now our responsibility is to keep that lamp gleaming. Only then we can show true respect and love to him.

This link contains some of his activities on beldihasra.org

A humble request

The Beldiha Orphanage (https://www.beldihasra.org), run by 'Mahajiban Dipak Ghosh', is in crisis due to his sudden demise. At this moment, the future of 16 orphan students, charitable clinics and other public welfare initiatives of the ashram are in complete darkness. Many kind people, after receiving this news, have expressed interest in keeping this good work alive.

Securing regular funding for the management of the ashram is now the biggest challenge. So a humble request to everyone, you can send help to the following account as much as possible. Each donation is invaluable and includes an income tax deduction under 80G.

Name: Beldiha Sri Ramakrishna Ashram
A/c: 11837225274
IFSC: SBIN0009897
Bank: State Bank of India
Branch: Pandugram, Hoogly

Foreign nationals or non-resident Indians will use the following account, if they want to send foreign currency from a foreign bank.

Name: Beldiha Sri Ramakrishna Ashram
A/c: 11837225310
IFSC: SBIN0009897
Bank: State Bank of India
Branch: Pandugram, Hoogly

When sending money, please make sure to email UTR, your address and phone number to rkabeldiha@gmail.com. If the receipt is not prepared accordingly, the grant cannot be used for the work of the ashram.

Finally, you are cordially invited to come to Beldiha Ashram to experience this huge work, once pandemic restrictions are over.
++++++

From, Anoushka Chowdhury
daughter of Soumalya Chowdhury, 1998 CST

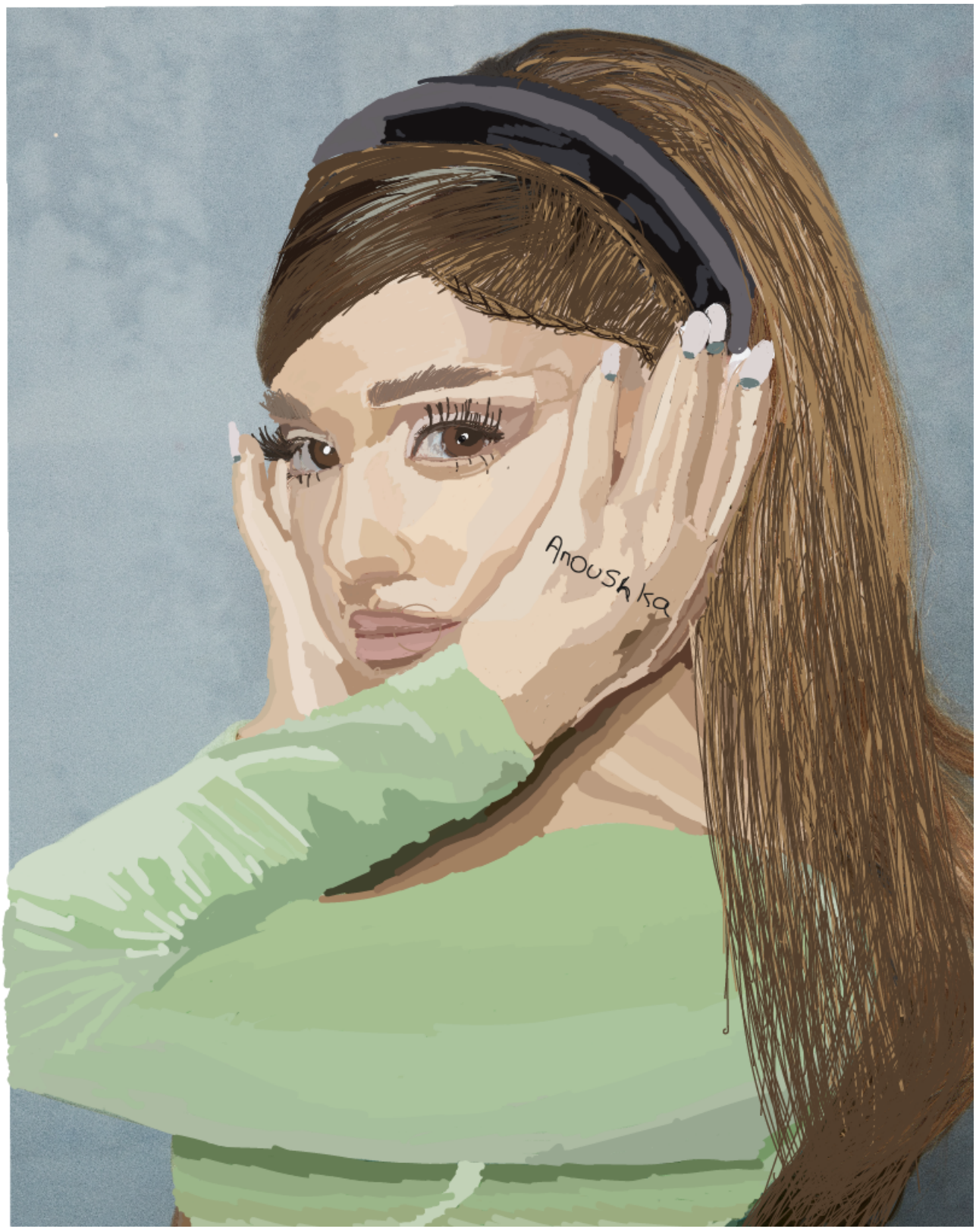

Cognizance

By Adrija Adhikary (Grade 6)

daughter of Sudip Adhikary, 2003 CST

Once there was a little girl, sitting on the ground,
watching the silent grave, proving sibling love.
The stones declared him dead, but she couldn't understand why,
until he came around and rose like a morning dove.

"I died in my own way," her brother said,
"I made bad choices."
"When I started, I could not stop,
even if I knew no good would come."
"Life is not for granted, it is like a rocky path,
make your decisions wisely, there will be no turn-backs"

Thus the spirit disappeared, leaving the girl alone,
left to ponder his words.
"Is it true?" she asked,
But she knew that it was true, there all along, hidden beneath a shady mask.

Pamyrica

Ritika De (daughter of Sheuli De, 1997 MET)

Disclaimer: Fey is another word for “they” in this story. As well as feir or “their”.

Back in the day when the stars sang and the mountains still touched the sky, an illness swept over the lands, taking humankind by force. This illness was like no other for it was not a regular illness, but an illness of the mind. Anger was raging right and left, absorbing mankind in a treacherous manner. Man reigned against man, and any previous orderly things threatened to diminish forever. This was all caused by the unbalanced system of the Creative Twins, which created elements that were unequal. Those working laboriously hard in order to maintain crops and survive gained almost none of the food, however, those who were lazy and sat back gained as much food as desired. The food rations were distributed unfairly to the people. They thus participated in vicious, animal-like battles to obtain food, property, and shelter, with survival on the line. While these traumatic events unrolled on Earth, there were some witnesses.
From above.
In the Sky world, people turned a blind eye to the catastrophe occurring below. However, three curious teens wanted to help the poor tiny humans on the Earth. Although the others had no sympathy towards the ant-like beings, the three wanted to fix the mistakes of the Creative Twins since they were their kind. Fey wanted to introduce peace and unity to the Earth below. Pax especially didn’t like labels so Fe convinced fe’s friends that they all should be non-binary. Ary and Amica agreed since they also didn’t like to be labeled. They wanted to have their own opinions on themselves and wanted to bring that positivity to Earth.
Some described it as bright as the sun coming down to visit the Earth. Others recall it as one of Saturn’s rings falling down to Earth. But either way, the legend means the same, Amica, Pax, and Ary said their farewells to the Sky World and came down to Earth, having to shrink down to a smaller size, though compared to humans (a mere ant’s size compared to Sky World beings), they were as large as their houses! Their introductory remarks, however, were met with snickers and laughs. Even though the Sky Beings said they wanted to offer them a better life, the humans were stubborn and doubted the Sky Beings words. They seemed like aliens from a 4-dimension, so how were they to trust what they saw before their eyes? Even after Amica’s, Pax’s, and Ary’s countless
explanations, they still did not believe their eyes and stated they would like to see proof that they weren’t a lie. It was a completely new topic for someone to try and help when all they’ve known for their whole lives is war. They were not sure how to explain something they’ve been doing their whole life without noticing. The Sky World beings discussed with After deep thought, Ary knew that they were each passionate about peace, friendship, and unity so this would be perfect for them to release the thoughts since no one would listen in the Sky World.

Amica and Pax were excited to finally speak out, which was relieving for them as well as a solution for the people. The people were still not sure about the view in front of them, but because of the warmth the so-called skyworld people had given them, they decided to listen. Amica, who always wanted to make new relationships with others, explained that friendship is more imperative and valuable than foes and enemies. Friendship and healthy relationships make you laugh, have fun, and relieve stress. It's a privilege to have people care and worry about you without having to ask them. Although they weren't introduced to friendship the citizens already had a strong bond with each other and had never given a second thought to the kindness they gifted each other. Smiling, the people accepted Amica because of feirs judgment. Surprised by the positive outbreak, Pax smiled brightly at Ary trying to show feirs excitement. Ary smiled knowing that Pax was usually never as eager as she was now. Pax took the sign as a yes, immediately started talking about her passion, peace. Pax shed fey peacefulness everywhere. The people were surprised by the wave of relief they had felt as Pax went around voicing her passion. Peace was something Pax believed in strongly! The people were taken aback and immediately accepted the pure Pax. Although Ary wasn't as pure as feir's friends fe also had an important message. Ary never got to speak fey mind because fe was considered too young to speak her mind. Because of her not being able to speak how fe feels, fe decided to teach others about the importance of speaking your thoughts and addressing your opinions positively without violence. Finally, the humans had agreed to them and very strongly believed that they could help them change their world.

Though they experienced a few bumps along the road, trust between the two was slowly forming. Once the people had accepted Pax, Ary, and Amica the three decided to stay since they grew fond of Earth and the people. Because of their height, they wouldn't be able to stay in the people's homes, but for days the citizens on the island worked together to create a large building called "The Gathering Hall". The three superiors, as the citizens of the islands called them, rested in the Gather Hall and would listen to each rant or wish each person told them. The three knew how twisted their world was before, so in order to try and make it more comfortable, they brought a wish to each of them every 6 months. Most of the wishes were about the stress of trying to work while cooking and handling all their troubles while trying to make time for their family. They had given them three nice holidays. First, they had given them Break Day, which is a time where they can spend time with their family, de-stress, and relax. This would happen at the middle of every month. Next, they gave them Speak Out Day. People would speak out about their struggles, problems, and worries so they can release all their stress out. After this, they would have many people to talk to about it that would understand, helping them overall improve their life. And finally, in order to celebrate the great actions of the mighty Superiors, Paxing Day was revealed, a day where all of the islands are united in a huge parade, sharing the joy of the peace brought to Earth by the brave souls' Pax, Ary, and Amica.

Like any other being, no matter what the size, Pax, Ary, and Amica eventually passed away. However, as a result of their brave actions and blessing to the land of Earth, they are greatly honored and will continue to belong in the future. Ary, known for fey health lessons, Amica, known for fey strong bonds, and finally Pax, known for fey peace, will forever be part of the Pamyrica culture.

A Broken wrist can't stop the summer fun!

By Somdeep Nath, 6th Grade

son of Moloy Nath, 2002 ETC

Some time ago, me, my parents, my friend Aarush, and his parents decided to go to Rhode Island and stay in an Airbnb for 3 days. Also, I went on this trip with a cast on my right hand. Sadly, Percy, my dog, could not go to Rhode Island and we had to leave him in daycare.

After eating breakfast one day, me and my parents took Percy and dropped him off at daycare. Right after that, we began the 3 hours and 21-minute journey to Rhode Island. It would have been that time without traffic, but SOMEBODY just had to crash their car so it would take us longer. We stopped at a rest area and I ate donuts, then we were driving through the traffic until we finally arrived at our destination, our rented Airbnb.

A few minutes later, Aarush and his parents came. We got into the house and checked it out! It had more than enough beds for us to sleep in, and it had lots of space! After that, me and my parents walked to a Mexican restaurant to eat lunch, but Aarush and his parents already ate lunch, so they didn't come with us. After lunch, all of us drove straight to a place called Narragansett Beach. It took about 45 minutes to get there. When we finally got to the beach, me and Aarush first went in the waves and the parents chilled on the sand. The waves were surprisingly calm. After a few hours, we had to go because the beach was closing, so we ate dinner at an Italian restaurant and drove to the Airbnb, played a little Monopoly, and went to bed.

The next day, we woke up and me and Aarush asked our parents if we could go to the beach again, but the parents said that today we would do almost EVERYTHING but going to the beach. Luckily, they said we could go tomorrow, so that was good. It was raining in the morning, so we stayed in and played Monopoly. In the afternoon, it stopped raining, so we went to a cliff walk. When we got there, we started walking on a lot of rocks, and in the middle of the rock path, there was a large pipe with a bad smell, so we held our breath. After that, we saw a university and I tried to climb a tree with my cast. Later, we went to a sightseeing place called 40 Steps. That was stairs with 40 steps, leading to a great place to take pictures. After that, we all drove to a sightseeing place called Brenton Point. There were lots of slippery rocks, and all of us except Aarush's mom went on the rocks. After going on the slippery rocks, we drove home, ate dinner, and went to sleep.

On the next day, we woke up and we received great news: We were going to the beach in the evening! After eating a quick breakfast, we got on a ferry to a place called Block Island. Once we were there, it was so hot that it felt like I would fall over at any point, so we could not walk much, therefore we took a cab to a place with lots of stairs, and at the bottom, there was a beach with lots of rocks. That beach wasn't kid-friendly, so we stayed for a little bit. Then we took a taxi back to the dock, where we came from the ferry, and ate lunch. After that, we took the ferry back and headed to Narraganset Beach. We got in the water and stayed there until we had to dry off and order sushi. After ordering, we went to see the sunset at a place called Beavertail Point. We saw the sun go down, and then we went home, and I ate dinner and finally beat Aarush in our 3-day game of Monopoly, then we slept.

On the final day, the day we would leave, we woke up, ate breakfast, and drove downtown, and got a snack. After that, we were heading on our way to New Jersey. When we were going home, there was LOTS of traffic, so it took about 4 and a half hours to go home, but first, we went to the daycare that we left Percy at, then we went home.

Rubbles at the Bubbles

By Aarush Samanta (5th Grade, son of Joydeep Samanta 2002 ETC)

It was almost the end of our Summer Vacation; so we decided to go to Maine to experience the beauty of Acadia National Park, the "Crown Jewel of North Atlantic Coast". The national park is in the eastern part of Maine. During our visit in Acadia we had done several hiking and out of that my favorite one was "The Bubbles". The Bubbles are 2 mountains which are located at the northern end of Jordon Pond, the clearest pond in Acadia. The Bubbles are best viewed from the southern end of Jordon Pond where the reflection of the 2 peaks in clear water of Jordon Pond makes an incredible view.

We started our hiking from the parking lot of the Bubbles to see the famous Bubble Rock. The Bubble Rock was named because of how the gigantic rock was balanced on the edge of a cliff. The Bubble Rock is a huge boulder carried by the glacier over tens of thousands of years ago.

In our hiking trail, we saw a divider leading to the North Bubble trail or the South Bubble trail. The South Bubble trail had the Bubble Rock while the North Bubble trail had the better view of Jordon Pond. So we decided to go to the South Bubble trail instead of the North one. The South Bubble trail is 0.5 miles long. Its elevation is 766 ft. We hiked the whole 0.5 miles and saw the Atlantic Ocean. On the other side we saw Jordan Pond but a few trees were blocking it so we couldn't get the complete view. We also saw the Bubble Rock and everybody was giving a pose of pushing the rock. Bubble Rock is for sure a giant rock.

While coming down from the summit of South Bubble mountain, we decided to hike to North Bubble summit too. The North Bubble Trail was shorter but steeper and difficult. The North Bubble trail is 0.3 miles long and the trail's elevation is 872 ft., even higher than the South Bubble trail. We had a great view of Jordan Pond and we saw the South Bubble trail too. Going down was even more intense and tough but it was great fun scrambling through many rocks. I almost fell two times but saved myself with chills going through my heart.

Oh Boy! I was so happy when we finished that arduous, complicated, scary, and exhausting trail.

The Password

By Soumalya Chowdhury, BEC-CST-1998

Steve woke up in the dark room. He wondered how long he was sleeping. The head is still heavy. It must have been some hangover from last night's party in the bar near his office. Tom called a cab and pushed him to the back seat. He does not remember anything after that. He cursed himself for not controlling himself enough. He has dreams for himself and the world. He had enough of living wild since graduating from college and starting in the engineering department of one of the most reputed firms in Wall street. In the firm, everybody is talking about building a giant datastore to house all sorts of data generated second by second; minute by minute from every corner of the bank's operation. They say that the firm has a large potential to monetize all the data it creates. It will transform the bank into a severely competitive technology firm in line with unicorns of the west coast. No longer will a bunch of "suits and tie-s" run the bank's business. The bank will upgrade to more modern infrastructure, competing for client's business in more modern channels where the current x-gens hang out. But the team is so large and so dispersed, he does not get a good sense of how he is contributing to that larger vision of his firm. Everybody he asks around has little idea of what exactly is going to be made in the end. It is very hard to connect between what he heard from his CEO during town hall vs what he is doing on a day-to-day basis. There are so many different pieces to the initiative, he lost all hope of making sense of it.

Since he heard about Satashi Nakamoto and his initiative, he is getting curious about how the new invention is going to change the world for the better. He thinks banks are run by cronies and the government works hands in arms. Together, they make sure the rich get richer and the poor become poorer. Disparity of wealth has been unprecedented lately while the banks are responsible to push the nation to the brink of failure. So many people lost their life's savings and so many more lost either their house or job or both during the last 2 years of the financial market meltdown. The people who are responsible for causing such distress are being rewarded as the government is pouring trillions of dollars into their coffers. This is not a free market in his opinion. In the free market, grown-ups compete fairly in level playing fields. But it seems big boys play mascho only when they are winning. They soon need the papa govt to babysit them as soon as they are in trouble. The free market fails by the intervention of the government.

Satashi Nakamato's whitepaper has such a great proposition which can alter the course of the free market forever. No longer will governments control the currencies or free enterprises. Bitcoin will bring out the price of the same goods and services to the same level in every corner of the world. World

trade will be without borders or tariffs for the first time in history. The governments do not control the value of currency any more. It's like John Lennon's song "Imagine" slowly turning into reality.

Steve turned the light on. This is his parent's house. He wondered how he ended up in his parent's house in Newton, NJ. His mother is standing on the door. "How are you feeling Steve? I will soon set up the dinner, Your dad has gone out to get the prescription ".

Steve wondered for a moment. The cab brought him to Newton instead of taking him to his loft in Hobboken. What would his parents think of him for being so wild after work and why would Tom send him off to his parents' house instead of his own apartment? It is not such a great deal to live through a hangover in his loft all alone. He started feeling embarrassed about the situation.

His mom said again "Your personal stuff is in the bag by the bed, join us at the dining table once you are ready". Steve looked at the bag and could not remember any reason why he would carry the bag to work or to the bar. It was not one of the Fridays when he would pack his bags to goto airport to fly off on a beautiful vacation.

His college computer is lying on the corner desk. He turned it on. The desktop is littered with files and programs. He thought to himself, after 3-4 years of work he is at least better off in organizing stuff in his computer. Besides, he now has a bunch of Xeon servers on his rig which he runs for 24 hours everyday in his loft. Ever since, he got hooked up to the world of block chain, he is mining bitcoins. At this time he is the proud owner of at least 50 bitcoins. This is the future currency of the world. Now these may be valued less than a couple of dollars each. But soon, the world will discover the worth of such treasures. He will be proud of being one of the early adopters of these little digital pieces.

Checking how many bitcoins have been mined since he left for office yesterday is really tricky. It requires accessing a digital wallet which opens only with a cumbersome private key. He stored that in his loft computer and also a backup in a hard drive which is password protected.

He left his chair to fumble in the bag which apparently came with him to his parent's house. Some change of clothes, some brochures of a consultant who practices hypnosis as therapy and also his hard drive which is packed in an airtight bag. He wondered about the consultant. Did anybody hand over the brochures on the street on the way back from the office? So many people distribute flyers about so many exotic services. Is it one of them? Why is he carrying the hard drive also? Is it not a rule not to carry any personal computer device to work?

However, he had to check his bitcoin balance. He is a proud miner. The technology seems to be producing some instant rewards, however small it might be. It's a matter of gratification after soulless work in the project. He opened the packet and plugged in the hard drive.

The screen asked for a password. He remembered it vividly. He made up the password by using the name of his sweet heart Tina. He typed "ILoveYouTina" on the screen. The hard drive opened. He connected his digital wallet by typing a few commands on his keyboard by using the digital wallet backup image stored in the hard drive. The balance got printed on his terminal. He has a balance of 257 bitcoins in his account. It is way more than what he thought had mined so far. He remembers clearly that had a total of 35 bitcoins when he left for office in the morning. So many more are mined in a day? He never averaged more than 2 bitcoins in a day. It's not just matching the SHA-key. It is about matching it before everybody else. Most of the time luck does not favor. This seems to be rainfall. He is now eager to see his log in his Xeon rigs.

He suddenly remembered he had to take Tina on a date to Mets. Tina is a girl of very good taste. Both of them like talking about arts & culture and going to concerts. She is definitely a girl to settle with for the rest of life. He planned to introduce Tina to parents and invite Tina the very next day when he is also in his parents' house. Tina might be pacified after the broken promise. This might also redeem some of his self-esteem in the eyes of his parents, or they might be thinking that he has gone too wild.

But he has to first call Tina to apologize.He rang 3 times. The phone is not answered. The voice mail is also not set up. He started worrying about Tina. He thought he should call Tom to ask for an explanation.He is his school buddy and then went to college together. He took a job in another firm. But he was living with his parents in Bayonne for a while to take care of his ailing mother. He cannot recollect his blackberry number he got from the office. He remembers his home number like the back of his palm.They spent so many hours planning out mischief as high school kids. He dialed the number. An old man answered "Hi I am Brandon Stremensky". Steve said "Mr Stremensky, may I speak with Tom, I am his friend Steve". Brandon paused for a while and then said "Tom has not come to see me this weekend. I know both you guys fell apart sometime back.I am now in the middle of my dinner. If he is not picking his phone, I will pass the message that you called. Good night!" This really caught Steve by surprise. Tom and he were hanging out until yesterday. Did he fight with him in the bar? He switched on the TV. They are announcing "President Biden is planning a 1 trillion dollar budget tomorrow". Is that a joke? They are calling Biden president instead of vice president on national TV. He switched channels. Another anchor reads "Bitcoin surged to 47,000 USD per coin;

Experts are claiming it might go up to 1 million USD each in a decade". His head started reeling. He had an account on facebook. He never got time to check there. He pulled it up on his screen in a few keystrokes. He saw his profile picture with a middle-aged lady faintly similar to Tina with a small child by their side. His status is married. Today's date is August 14, 2021. He clearly remembers signing his timesheet for September 10, 2011 in the office.

Why is nothing matching up? Is he in some kind of dream? He pinched himself. Still very much awake. He cannot change his current state. He jumped out of the room. The mom's living room seems to have a new set of furniture. The dining table is much smaller than what he saw last time. When did they change all these?

His mom found him panting for air in the dining room. "Son, you have to adjust to this new reality. Doctor said you lost 10 year's memory. They will try all avenues to bring your memory back". The world all of a sudden came crashing down to him. He is not able to recollect how he ended up in the living room. He now cannot remember what happened even before he started his tv. But he remembers everything that happened in the office and the bar until he passed out.

One month before

Steve was wandering in his backyard. He has high hopes for this so-called doctor who will be performing hypnosis on him. He desperately needs to remember one thing. His password for the hard drive. He already tried 8 times and everytime he failed. That has left him with only 2 last tries. If he fails in those last two tries, his hard drive will be encrypted forever, never to be recovered by any means.

In his hard drive he has the bitcoin digital wallet image which will give him access to his 257 bitcoins. In today's market, its value is more than 11.5 million USD. Once he encash-es that he will not have to work for the rest of his life. Even he can secure the life of his son. He can send him to an Ivy league to become a doctor. Engineers are living a very uncertain career. Those who had some successful start-ups in the west coast are the poster boys. The rest are under grind. The respect of the past is gone. As the labour force is opened out to the world, engineers can be hired dozens a dime with no guarantee of job security. He is working extra hours with no hope of any respite soon. His job with a consulting firm takes him to new places every week. His time is spent mostly flying to client's offices in any part of the world. New York and New Jersey real estate has become too expensive. He constantly fears about

not being able to pay the monthly mortgage of his house in the suburb. He has lost touch with his son which brought him the most joy in recent times since he had met with Tina.

Tina also has distanced herself little by little. When Steve finally lost control and fell in great despair, Tina had left with their child. Tina found him to be too unstable to raise a small child. He would be drunk while at home and cursing everybody. The prospect of losing his only fortune of bitcoin made him mad. In spite of advice from everybody including his parents and best buddy Tommy to make peace with losing the bitcoins, Steve will not budge. His desperation will get the better of him. He had already been cited for DUI and spent the night in hospital ICU after opioid overdose.

This hypnosis consultant is his last hope. He doesn't know what he would do if he still cannot remember the password to the harddrive. He already had two sessions with him in Los Angeles. He flew there for a couple of half hour sessions. He just felt relaxed but nothing seems to have come back in his memory. In his final session, the hypnotist asked him to carry his hard drive. He is already late to start from home. He was too doused in the basement. He thought calling an uber is not going to help him catch the flight. After all, these drivers are too slow. They don't know how to cut the traffic on the way to JFK. The beltway is always jammed. But he lost his license to DUI. However, would he really care? He is already living a miserable life. How much more miserable the cops are going to make his life from here? He picked up his car key and vroom-ed right to the street.

The roads are traffic logged as usual. He just came to a signal which turned red a few milliseconds ago. Why not just pass away before traffic from other sides starts? Then while he was in the middle of the crossing, a truck came from the side and rammed into his vehicle. Airbag opened from the front but the hit came from the side. Steve lost his sense.

Steve is in the hospital. He recovered from the pain. But the trauma has scarred his brain. Doctor released him after a month to go to live with his parents. He has lost 10 years of memory. Medical science has not progressed enough when it comes to treating memory loss. Steve quietly led himself to his destiny.

সুখ পাখি

নবেন্দু সিনহা (1998 CST)

একটা পার্টির জন্য মনটা যেন ছটফট করছিল মহুয়ার। করোনার জন্য কবে থেকে ঘরে বন্দি। জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী অথবা বিয়েবাড়ি – কোনো কিছুরই নেমন্তন্ন নেই! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেই একঘেয়ে জীবন। তাই যখন সুযোগটা এল তখনই পার্টি করার ইচ্ছেটা চেগে উঠল মহুয়ার।
অভিজাত এক আবাসনের বেশ বড় এক ফ্ল্যাটে থাকে মহুয়া। স্বামী আর এক মেয়ে নিয়ে ছোট সংসার। করোনার জন্য যদিও এখন চব্বিশ ঘন্টার একজন লোক রাখা হয়েছে। বাসন্তী না থাকলে যে কি হতো! বাসন্তী ওর অনেকদিনের পুরনো কাজের লোক। কাছেই বাড়ি। কিন্তু করোনার জন্য এখন নিজের মেয়েকে নিয়ে মহুয়ার ফ্ল্যাটেই থাকে। বাসন্তী মহুয়ার অনুরোধটা ফেলতে পারে নি। শুধু বলেছিল, "বৌদি আমার মেয়েকেও রাখতে হবে কিন্তু! পূজার সরকারি হোস্টেলটা বন্ধ হয়ে গেছে গেলমাস থেকে।" মহুয়া এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল।করোনার মধ্যে জিনিয়াও একজন খেলার সাথী পাবে। একমাত্র মেয়ে জিনিয়া এক নামি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ে। এখন তো শুধু অনলাইন ক্লাস। তাই কোনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত হয় না।। আর পূজা মেয়েটি বেশ শান্ত স্বভাবের। তাই মহুয়ার ফ্ল্যাটে গত ছমাস ধরে ওরা থাকছে। বাসন্তী শুধু মাসের প্রথম দিন ওর বরকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেয়। টাকা হাতে পেলেই ওর বর খুশি। বাসন্তী কোথায় থাকল তাতে ওর বরের কিছু যায় আসে না।

এরমধ্যেই দুটো ঘটনা প্রায় একসঙ্গে ঘটল। প্রথমত কালকেই জানা গেল যে ওদের আবাসনে এই মুহূর্তে কোনো করোনা আক্রান্ত নেই এবং প্রায় সবারই ভ্যাকসিনের দুটো ডোজ নেওয়া হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত গতকালই জিনিয়ার স্কুলের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। জীবনে এই প্রথম ও ক্লাসে ফার্স্ট এসেছে। সুতরাং দুয়ে দুয়ে চার বলা যায়। তাই ভাবলো যে আবাসনের কয়েকজনকে ডেকে ব্যাপারটা সেলিব্রেট করা যেতে পারে। অপূর্বকে জানাতে ও কোনো আপত্তি জানাল না। মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে অপূর্ব খুব একটা মাথা ঘামায় না। কিন্তু মেয়ের আশাতীত ফলের খবর শুনে ওর মনও বেশ উৎফুল্ল হয়ে আছে। তাই পার্টির কথা শুনে অপূর্বও এককথায় রাজি হয়ে গেল।

বেছে বেছে চারজনকে ফোন করলো মহুয়া। খুব বেশি লোককে ডাকার মত পরিস্থিতি
এখনো তৈরি হয় নি। করোনা দেশ থেকে পুরোপুরি চলে যায় নি। শোনা যাচ্ছে নাকি এরপর আবার তৃতীয় ঢেউ আসতে পারে। সুতরাং খুব বেশি লোক সমাগম হলে একটা ভয় থেকেই যায়। যতই হোক, বাচ্চারা তো এখনো ভ্যাকসিন পায় নি!

মহুয়ার ডাক পেয়ে চারজনই রাজী হয়ে গেল। দোলা তো বলেই ফেলল, "থ্যাংকস মহুয়া! ঘরে বসে বসে যেন দমবন্ধ হয়ে আসছিল। অনেকদিন পর একটু জমিয়ে আড্ডা মারতে পারবো।"

***

সন্ধে সাতটা বাজতে না বাজতেই একে একে সবাই এসে হাজির। প্রথমেই এল রিচা আর ওঁর মেয়ে রিয়া। ওঁর বর চাকরী সূত্রে এখন বিদেশে আটকে পড়ে আছে। করোনার জন্য এখন বিমান চলাচল বন্ধ। তাই রিচা একা হাতেই সব সামাল দিচ্ছে। রিয়া জিনিয়ার থেকে দুবছরের ছোটো।জিনিয়ার বেশ ভাল বন্ধু।

তার পর এল অদিতি আর ওঁর বর অনিক। দুজনেই কলেজে পড়ায়। ওদের ছেলেমেয়ে নেই। অদিতির গানের গলা খুব সুন্দর। জিনিয়া ওঁর কাছে গান শেখে। যদিও এখন সেটাও অনলাইনে।

এরপর এল দোলা, সঙ্গে ওর বর রাজীব আর ওদের একমাত্র মেয়ে মিৎসা। জিনিয়ার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে কিন্তু অন্য স্কুলে। রাজীবের একটা ছোটখাটো ব্যবসা আছে।

সবশেষে এল অনামিকা আর ওঁর ছেলে অনিক। ওঁর বরও চাকরী সূত্রে পুনেতে থাকে। অনিক জিনিয়ার থেকে দুবছরের বড়। খুব ভাল গীটার বাজায়।

সবাই জিনিয়ার জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে এসেছে। দোলা তো একটা আস্ত কেক নিয়ে হাজির যাতে বড় করে লেখা "প্রথম"। সবার মনেই প্রথম হবার একটা সুপ্ত বাসনা থাকে। মহুয়ারও ছিল। কিন্ত কোনদিন হতে পারে নি। বরাবর কম পড়াশোনা করেও ওঁর বন্ধু মণিকা প্রথম হতো। খুব ভাল বন্ধুত্ব থাকলেও মহুয়া ভেতরে ভেতর ওকে একটু ঈর্ষা করতো। মণিকা এখন আমেরিকায় ক্যালটেকে গবেষণা করে। মেয়ের খবরটা জানাতে কালকেই ওকে হোয়াটসঅ্যাপে কনগ্র্যাচুলেশন্ জানিয়েছে।

কিছুক্ষনের মধ্যেই পার্টি জমে উঠল। কেক কাটার পর মহুয়ার মুখে একটা টুকরো গুঁজে দিল জিনিয়া।
দোলা বললো, "প্রাউড্ মম্!"
সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল। মহুয়ার মনে হল এই মুহূর্তটার জন্য কতদিন ও অপেক্ষা করে ছিল।
সবাইকে এরপর কেক্ আর মিষ্টি প্লেটে সাজিয়ে দিল বাসন্তী। পূজাও মাকে সাহায্য করলো।
রিচা জিগ্গেস করল, "মেয়েটি কে মহুয়া ?"
"ওর নাম পূজা। বাসন্তীর মেয়ে। ওর স্কুল বন্ধ। ওদের তো আর অনলাইন ক্লাস হয় না!"
"কোন ক্লাসে পড়িস তুই ?" পূজার হাত থেকে প্লেটটা হাতে নিল রিচা।
"ক্লাস নাইনে", মাথা নিচু করে উত্তর দিল পূজা।
"কাজ কর্ম সব পারিস ?"
"ও তো হোস্টেলে থাকত দিদি। একা একাই সব কাজ করতে পারে!", বাসন্তী বললো।
রিচা ভাবলো পরে মহুয়াকে বলে দেখবে যদি পূজাকে ওর বাড়িতে কাজে লাগানো যায়। অনেকদিন থেকে ও একটা রাত দিনের লোক খুঁজছে।
কিছুক্ষনের মধ্যেই গল্প গুজবে মশগুল হয়ে গেল সবাই। অপূর্ব, অনিক আর রাজীব রাজনীতি, করোনা আর দেশের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনায় ডুবে গেল। সবার হাতেই হুইস্কির গ্লাস। রাজীবের প্রশ্ন, "দেশের বেকারত্ব এত বাড়ছে অথচ শেয়ার বাজার দিনে দিনে বেড়ে চলেছে কী করে ?"
জিনিয়া ওর বন্ধুদের সঙ্গে মোবাইল ফোন নিয়ে ডুবে গেল। অপূর্ব গত জন্মদিনে ওকে একটা আইফোন কিনে দিয়েছিল। তাতে ওর অনেক গেমস ছারাও একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আছে। বড় বড় সেলিব্রিটিদেরকে ফলো করা ওঁর নেশা। বন্ধুদের ঐসব দেখাতেই ও ব্যস্ত।
এদিকে সবাই অদিতিকে অনুরোধ করল একটা গান করার জন্য। অদিতি রাজী হয়ে গেল। অনিকও ঝট করে ওর গিটারটা নিয়ে এল।

অদিতি গান ধরল, "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা"। জিনিয়াও সঙ্গে গলা মেলালো। তারপর অনুরোধ এল আরো একটা গানের। তারপর আরো একটা···। এইকরেই কখন যে ডিনারের সময় হয়ে গেল। মহুয়া ভাল খাসির মাংস রান্না করতে পারে বলে খ্যাতি আছে। অপূর্ব সকাল সকাল তিন কেজি কচি পাঁঠার মাংস কিনে এনেছিল। সঙ্গে গলদা চিংড়ি। বাসন্তী সব রান্নার মশলা জোগাড় করে রেখেছিল। অপূর্ব বলেছিল জোমাটো থেকে সব খাবার অর্ডার করে আনাবে। মহুয়া রাজি হয় নি। নিজে হাতে রান্না করে খাওয়ানোর একটা আলাদা আনন্দ আছে।
খাওয়ার শেষে রাজীব বললো, "এই পাঁঠার মাংসের স্বাদ কোনদিন ভুলতে পারব না!" সবাই প্রায় একসঙ্গে সমস্বরে সমর্থন জানাল। অনামিকা বললো, "রেসিপিটা আমাদের কে জানিয়ো কিন্তু মহুয়া"। মহুয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানালো। জোমাটো থেকে খাবার আনালে কি আর এই প্রশংসাটা পাওয়া যেত ?

****

এখন রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি । পার্টি শেষে সবাই একে একে বাড়ি চলে গেছে। বাসন্তী এরমধ্যেই সবকিছু পরিষ্কার করে ফেলে নিজের ঘরে পূজাকে নিয়ে শুতে চলে গেছে। অপূর্বও ঘরে এসি চালিয়ে বিছানায় চলে গেছে। জিনিয়াও নিজের ঘরে দরজা ভেজিয়ে ঢুকে গেছে। কিন্তু দরজার নিচ দিয়ে একটা হাল্কা আলোর রেখা আসছে।
মহুয়া বারান্দায় এসে দাঁড়াল । আজ আকাশে চাঁদ যেন ঝলমল করছে। চারিদিকে শুধু এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। শুধু একটা কুকুরের ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। আবাসনের অধিকাংশ বাড়িতেই এখন আলো নিভে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে মনটা প্রসন্ন হয়ে গেল মহুয়ার। ঠিক এরকমই যেন দিনটা চেয়েছিল ও। জীবনে প্রথম না হওয়ার যে দু:খটা মনের ভেতরে ছিল, সেটা অনেকটাই প্রশমিত হল আজ।

হঠাৎই একটা ডুকরে ওঠা কান্নার আওয়াজ শুনে চমকে উঠল মহুয়া। কোথা থেকে শব্দটা আসছে ? শব্দটা তো জিনিয়ার ঘর থেকে আসছে! দৌড়ে জিনিয়ার ঘরের সামনে পৌঁছে গেল মহুয়া। দরজাটা একটানে খুলে দেখল জিনিয়া বিছানায় গিফ্টগুলো সাজিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।
"কি রে কী হয়েছে ? কাঁদছিস কেন?"
"আমি প্রথম হইনি মা।"
"এসব তুই কি বলছিস!"
"হ্যা। সত্যি বলছি। আমি অঙ্কতে একশ পেতে পারি না। আমার বদলে পূজা পরীক্ষা দিয়েছে। ও অঙ্কে খুব ভাল। আমার বদলে ঐ তো সব ক্লাস করতো। আমি তো ফোনে শুধু গেমস খেলতাম!"
"তোদের ক্যামেরা চালু রাখতে হয় না ?"
"না রাখলেও হয়। আমি তো বলে দিয়েছিলাম যে আমার ক্যামেরা খারাপ। ওরা আর কিছু বলে নি।"
"তাহলে এখন কাঁদছিস কেন ?"
"আমার খুব খারাপ লাগছে মা। এই গিফ্টগুলো তো পূজার পাওয়া উচিত। তুমি কিন্ত ওকে কিছু বোলো না। ও প্রথমে রাজি হয় নি। আমি জোর করে ওকে রাজি করিয়েছি।"
মহুয়ার স্বপ্নগুলো যেন একমুহূর্তে সব চূর্ন হয়ে গেল।
গলাটা শক্ত করে বললো, "খুব অন্যায় কাজ করেছ। এখন অনেক রাত হয়েছে। ঘুমাতে যাও।"

মহুয়া আলোটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের ঘরে এসে দেখল অপূর্ব বিছানায় শুয়ে পড়েছে। দরজার শব্দ শুনে অপূর্ব জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে ?"

মহুয়া এক মুহূর্ত ভেবে বললো, "কিছু হয় নি।"

অপূর্ব পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। মহুয়া ভাবলো জীবনের কিছু দু:খ বোধহয় নিজের কাছে রেখে দেওয়াই ভাল। শুধু পার্টির স্বাদটা তিক্ত হয়ে গেল।

***

"মা এবার কি হবে ? ওরা কী আর তোমায় কাজে রাখবে ?" ফিসফিস করে বললো পূজা।জিনিয়ার কান্না আর মহুয়ার গলার শব্দ শুনে ও ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে।

"বৌদির রাগ কালকেই কমে যাবে। তুই চিন্তা করিস না। কাজে ছাড়িয়ে দিলে আমি অন্য কাজ খুঁজে নেব। তোর পড়াশোনার খরচ আমি ঠিক চালিয়ে দেব।"

"আমাকে ও জোর করে পরীক্ষায় বসিয়ে দিল। ওর কথা ফেলতে পারলাম না মা।"

"তুই অঙ্কে একশয় একশ পেলি ?"

"আমার অঙ্ক করতে খুব ভাল লাগে মা।"

"ঠিক আছে, তুই কিছু চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন ঘুমিয়ে পর।

বাসন্তী আলতো করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

ভ্যাকসিন্

Nabendu Sinha (1998 CST)

বাদল আজ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছে।

আজ ও ভ্যাকসিন্ নিতে যাবে, তাই চিন্তায় কাল রাতে ভালো ঘুম হয় নি। চারিদিকে ভ্যাকসিন্ নিয়ে কতো গুজব যে শোনা যাচ্ছে! পাশের পাড়ায় নাকি একজন ভ্যাকসিন্ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে। এদিকে আবার করোনার ভয়! কতো চেনা লোক যে মরে গেল! চিনের ওপর রাগ করে বাদল ভেবেছিল চাওমিন খাওয়া ছেড়ে দেবে! কিন্তু লোভ সামলাতে পারে নি। দু দিনের মধ্যেই প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেছে। পাড়ার বৌদির একটা চাওমিনের দোকান আছে।বাদল প্রায় ওখানেই খায়। সঙ্গে এক কাপ চা। বৌদির সঙ্গে একটু গল্প গুজবও করে। বাদল চাওমিনে ঝাল বেশি খায় কিন্তু চায়ে একটু মিষ্টি বেশি খেতে পছন্দ করে। তাই বৌদি মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করে, “চায়ে আরেকটু মিষ্টি দেব বাদলদা?”

বাদলের তিন কুলে কেও নেই। সঙ্গী বলতে একটা অটো। দিনে তিনটে সিফ্ট চালায়। যা আয় হয় তাতে ওর একার ভালোই ঢলে যায়।বাসন্তী কলোনীতে একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। এখন লকডাওন চলছে। অটো চালানো বারণ। তাই সময় যেন আর কাটতেই চায় না।পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে দুবেলা। ক্লাবের টিভিতে একসঙ্গে খেলাও দেখে। বাদল ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক। কতদিন যে খেলা দেখতে মাঠে যাওয়া হয় না!

বাদলকে অনেক প্যাসেন্জার জিজ্ঞেস করে যে ও ভ্যাকসিন্ নিয়েছে কিনা। ও এখনো নেয় নি শুনে তারপর কেউ কেউ অনেক জ্ঞান দেয়।বাদল চুপ করে শোনে। আবার অনেক প্যাসেন্জার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। ওদের কথাবার্তা বাদলের কানে আসে। তা থেকেই ও জানতে পেরেছে যে একই ভ্যাকসিন্ নাকি সবাইকে দুবার নিতে হবে!

গতবছর একটা স্মার্ট ফোন কিনেছিলো। ওতে অনেক হোটাসঅ্যাপ মেসেজ পায়।একটা মেসেজ এসেছিল যে ভ্যাকসিন্ নিলে নাকি দুবছর পর সবাই মরে যাবে! কিন্তু রেডিওতে মীরদা বলে যে ভ্যাকসিন্ খুব সেফ্। হোটাসঅ্যাপের মেসেজগুলো গুজব। তাছাড়া পরিচিত অনেকজন তো ভ্যাকসিন নিয়েছে। সবাই তো বেশ ভালোই আছে! দুবছর পর কি হবে তা পরে ভাবা যাবে।

কাছেই একটা সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফ্রীতে ভ্যাকসিন্ দিচ্ছে। বাদল দুদিন গিয়েছিল। কিন্তু ভ্যাকসিন্ পায়নি। লম্বা লাইন ছিল। ভোরবেলা থেকে লোকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে! ওরা শুধু প্রথম একশো জনকে ভ্যাকসিন্ দেয়। বাদলের নম্বর আসার আগেই ভ্যাকসিন্ শেষ হয়ে গিয়েছিল।তাই আজ ও ঠিক করেছে সকাল সকাল যাবে।
অটোটা স্টার্ট দিয়ে ভগবানকে তিনবার প্রণাম করে নিল বাদল। রাস্তায় যদি আজ পুলিস ধরে তাহলে বুক চিতিয়ে বলবে যে ও ভ্যাকসিন্ নিতে যাচ্ছে।
কলোনী থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে একটা বাঁক নিলেই বৌদির দোকান। ও দেখলো দোকান খোলা আছে। অটোটা রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে বৌদির দোকানের দিকে এগিয়ে গেল বাদল।
“এতো সকাল সকাল কোথায় যাচ্ছ বাদলদা?”, ওঁকে দেখে বৌদি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।
“ভ্যাকসিন্ নিতে যাচ্ছি। এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট দাও দেখি!”
বৌদির আসল নাম মালতী। ও একাই দোকান চালায়। ওর পনেরো বছরের এক ছেলে আছে। সে মাঝে মাঝে এসে হাত লাগায়। ওর বর অনেকদিন হলো বাংলাদেশ চলে গেছে।ফিরবে কিনা কেউ জানে না। বৌদি বলে বাংলাদেশে নিশ্চিত ও আরেকটা বিয়ে করেছে।

“তুমি ভ্যাকসিন্ নেবে না বৌদি ?”
মালতী একটু মুচকি হেসে বলে, “আমার ইন্জেকশনে বাপু খুব ভয় করে!”
বাদল হো হো করে হেসে ওঠে বলে, “তোমার জন্য ডাক্তারবাবুরা নাকের স্প্রে বার করছে গো। আর ইন্জেকশন নিতে হবে না!”
মালতী বলে, “তুমি আর আমার সঙ্গে রসিকতা কোরো না বাপু!”
বাদল আর বললো না যে এই সব কথা ও প্যাসেন্জারদের কাছ থেকেই শুনেছে। এই ভ্যাকসিন্ নাকি নাক দিয়ে শুধু টানলেই হবে, শরীরে আর সুঁচ ঢোকাতে হবে না!

বৌদি নিজে সেলাই করে কতোগুলো কাপড়ের মাস্ক বানিয়েছিল। বাদলকেও দুটো দিয়েছে। বাদল টাকা দিতে চেয়েছিল কিন্তু বৌদি নেয় নি। বাদল ঐ মাস্কগুলো ধুয়ে ব্যাবহার করে। পয়সা দিয়ে আর কতো নতুন মাস্ক কেনা যায়?

বৌদিকে চায়ের দাম মিটিয়ে বাদল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দিকে রওনা দিল। যাওয়ার আগে বৌদি বললো, “দুগ্গা, দুগ্গা!”

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছে বাদল দেখলো যে এর মধ্যেই লম্বা লাইন পরেছে। কেউ কেউ আবার লাইনে ইঁট্ পেতে দূরে একটা গাছের তলায় অপেক্ষা করছে।

দরজার সামনে একজন স্বাস্থ্যকর্মী টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে আছে। বাদল এর আগে দুবার এখানে এসেছে। তাই নিয়ম কানুন ওর জানা।

বাদল যেতেই লোকটা জিজ্ঞেস করলো, “আধার কার্ড আছে তো? ফার্স্ট ডোজ?””
বাদলের আধার কার্ড সবসময় ওর মানিব্যাগে থাকে। ও ঘাড় নারতেই লোকটা ওর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল। কাগজে নীল কালিতে হাতে লেখা ১০০ নম্বর। তার নিচে একটা রাবার স্ট্যাম্পের ছাপ। বাদল বুঝলো আরেকটু দেরি করলে আজকেও ফিরে যেতে হতো।

কাগজটা হাতে নিয়ে বাদল লাইনে এসে দাঁড়াল। এখনো ভ্যাকসিন্ দেওয়া শুরু হয় নি। যে ভ্যাকসিন্ দেবে সে নাকি এখনো এসে পৌঁছায় নি। লাইনের দিকে ভালো করে একবার চেয়ে দেখলো বাদল। সেরকম কাউকে চিনতে পারল না। সব বয়সী লোকেরা এসেছে। মহিলাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এর মধ্যে অনেকেই হয়ত ওর প্যাসেন্জার। কতো লোক যে অটোতে ওঠে! সবার চেহারা মনে রাখা সম্ভব নয়। তবু অনেককে দেখে মনে হয় যেন মুখটা চেনা চেনা। আগে যেন কোথায় দেখেছে।

লাইনে ওর সামনে একজন মহিলা ফোনে কথা বলছে। বাদল শোনার চেষ্টা করলো ও কি নিয়ে কথা বলছে। ওর এই এক বদ অভ্যাস। প্যাসেন্জারদের কথা শুনতে শুনতে মনে হয় এই অভ্যাসটা হয়ে গেছে।
মহিলাটা কাউকে ওর ছেলের স্কুলের পড়াশোনার চাপ নিয়ে বলছে। এই ব্যাপারটা শুনে শুনে ওর কান পচে গেছে। প্যাসেন্জাররা প্রায় এটা নিয়ে আলোচোনা করে। তাই বাদল আর কান দিল না। ওর তো এখনো বিয়েই হয় নি! ছেলের স্কুল তো অনেক দুরের কথা!

লাইনে বাদলের পেছনে আর কেও নেই। বাদল লক্ষ্য করল যে বেশ্ কিছু লোক এসে ফিরে যাচ্ছে। বুঝল কুপন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল বাদল। বৌদির দোকানে আর কিছুক্ষন থাকলেই আর বোধহয় ভ্যাকসিন জুটত না।

এক বাদামওয়ালা আর একজন চাওয়ালা ঘুরে ঘুরে লাইনে বাদাম আর চা বিক্রির চেষ্টা করছে। এখন লোকাল ট্রেন বন্ধ। তাই হকারদের কাজ নেই। বাদল ভাবল একটু চা খাবে। গলাটা শুকিয়ে এসেছে। চাওয়ালাকে হাঁক দিয়ে ডাকলো,"একটা চা দাও দেখি?"
"পাঁচ টাকার না আট টাকার?"
বাদল দেখল কাগজের কাপের দুরকম মাপ। ও বললো, "একটা ছোটো দাও"।
মানিব্যাগ বার করে ওর হাতে পাঁচ টাকা গুঁজে দিল বাদল।
চা শেষ করে বাদল আবার লাইনে অপেক্ষা করতে থাকল বাদল। লাইনে দাঁড়িয়ে অনেকে সেলফি তুলছে। সময় যেন আর কাটতেই চায় না।

প্রায় আধঘন্টার কিছুক্ষন বাদে লাইনটা একটু নড়ে চড়ে উঠলো। বাদল বুঝলো ভ্যাকসিন্ দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। যারা ইঁট পেতে গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল তারা সবাই আবার লাইনে এসে গেল।

ঘন্টাখানেক দাঁড়ানোর পর মূল দরজার অনেকখানিই কাছাকাছি পৌঁছে গেল বাদল। এখানে কোভ্যাকসিন্ এবং কোভিশিল্ড্ দুরকম ভ্যাকসিন্ই দেওয়া হচ্ছে। বাদলকে যা দেবে ও তাই নেবে।
হঠাৎই একটা গাড়ির শব্দে ঘুরে তাকালো বাদল।

দুটো গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। একটা কালো রং এর হন্ডা সিটি থেকে পান্জাবি পরা একজন লোক নেমে দাঁড়াল। ওর চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। পেছনের দরজা দিয়ে নামল আরো দুজন মহিলা। দুজনের চোখেই রঙীন সানগ্লাস। পেছনের গাড়িটা টাটা সুমো। ওই গাড়ি থেকে নামল চারজন হোমরা চোমরা লোক। সবার পরনে একই রং এর জামা। বাদল বুঝলো এঁরা পারসোনাল সিকিওরিটি। ওরা ওদের তিনজনকে ঘিরে ধরে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দিকে নিয়ে গেল। ওঁদেরকে দেখে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "আসুন স্যার, আসুন স্যার!"

লোকটা ওর সঙ্গীদের নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর বেশ কিছুক্ষন কেটে গেল। লাইন যেন আর এগোচ্ছেই না।বাদল বুঝলো ঐ লোকগুলো এখন ভ্যাকসিন্ নিচ্ছে।

বাদল বুঝলো এ নিশ্চিত খুব প্রভাবশালী লোক। হয়তো কোনো রাজনৈতিক নেতা! লাইনে সবার মুখে হতাশার ছাপ। কোনো লাইনে না দাঁড়িয়েই লোকটা ভ্যাকসিন্ পেয়ে গেল! কেউ প্রতিবাদ করলো না! ধীরে ধীরে লাইন এগোতে এগোতে এইভাবে আরো একঘন্টা কেটে গেল।

এই সময় হঠাৎই একজন নার্স বাইরে এসে ঘোষণা করলো, "আমাদের কোভিশিল্ড শেষ।যারা দ্বিতীয় ডোজের জন্য অপেক্ষা করছেন তারা কালকে আসবেন। এখন শুধু কোভ্যাক্সিনের প্রথম ডোজ দেওয়া হবে।"
বাদলের ঠিক দুজন আগে একটা বুড়ো হতাশ হয়ে দুই হাত তুলে প্রতিবাদ করতে গেল কিন্তু কোন লাভ হল না। নার্সটা ভেতরে ঢুকে গেল। আর বুড়োটা গজ্ গজ্ করতে বাড়ীর দিকে হাঁটা দিল। বাদল এখন লাইনে চারনম্বরে।

বাদল যখন মনে মনে ভাবছে যে পরের জন্মে যেন প্রভাবশালী হয়ে জন্মায়, ঠিক তখনই ওর কাঁধে কেও যেন হাল্কা টোকা দিল।

বাদল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল যে এক বুড়ি ওর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে কিছু বলতে চাইছে। পরনের কাপড় বেশ ময়লা। চেহারায় দারিদ্রের ছাপ বেশ স্পষ্ট।
"কিছু বলবে?"
"বলছি বাবা তুমি আমার একটা উপকার করলে খুব ভালো হয়!"

“কী হয়েছে?”
“আমার ছেলের কাজ চলে গেছে। দুবেলা পেট ভরে খেতে পারছি না”, বুড়ির চোখে জল।
বাদল ভাবলো কিছু টাকা দেবে।মানিব্যাগটা বার করতে গেল।
কিন্তু বুড়ি বললো, “টাকা লাগবে নি, তুমি যদি লাইনটা ছেড়ে দাও তাহলে খুব ভালো হয়। ওই বাবু তাহলে আমাকে পাঁচশো টাকা দেবে।”
বুড়ি গাছতলার দিকে একটা লোককে ইশারা করে দেখালো।
বাদল দেখলো গাছতলায় একটা লোক প্যান্ট জামা পরে, হাতে খবরের কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাদলের প্রথমে খুব রাগ হলো।কুপন নিয়ে এতোক্ষণ ও লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই লাইন ও আরেকজনকে ছেড়ে দেবে? কিন্তু বুড়ির মুখটার দিকে তাকিয়ে ওর মায়া হলো।
বুড়ি চোখে জল নিয়ে বললো, “ওপাড়ায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আরেকজনকে লাইনটা দিয়ে এই আসতিছি। খুব দেরী হয়ে গেল। এরা আর কুপন দিচ্ছে না গো!”

\- \- \-

অটোটা বৌদির দোকানের পাশে রেখে বাদল হাঁক দিল, “বৌদি এক প্লেট চাওমিন্ দাও দেখি!”
বৌদি বললো, “ভ্যাকসিন্ নিয়েছো বাদলদা?”
“না গো, কাল তোমাকে নিয়ে একসঙ্গে যাব। সকাল সকাল তৈরী হয়ে থেকো!” বাদল ভাবল এবার বৌদির ভাগ্য পরিক্ষা করে দেখবে – নিজের ভাগ্যে তো আর ভ্যাকসিন্ জুটল না!
মালতী কি বলবে আর ভেবে পেল না!

With Best Compliments from our sponsors:

NEW YORK LIFE

New York Life Insurance Company

379 Thornall Street, 8th Floor, Edison, NJ 08837

- Life Insurance
- Fixed Immediate and Deferred Annuities*
- Mortgage Protection through Life Insurance
- Business Planning
- Health Insurance **
- Disability Income Insurance **
- College Funding
- Retirement Funding
- Spouse/Children/Grand Children's Insurance
- Charitable Giving
- Long Term Care Insurance
- Service on existing insurance

SAMRAGNEE MAJUMDAR

Agent, CA Lic. # 4029791

Mobile: 732.692.4818

smajumdar@ft.newyorklife.com

* Issued by New York Life Insurance and Annuity Corporation (A Delaware Corporation) ** Products available through one or more carriers not affiliated with New York Life, dependent on carrier authorization and product availability in your state/city

---

Remember to visit our website:

https://becaaeastcoast.org/